জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা

মোঃ মনিরুল ইসলাম ভূইয়া
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃনং : ৪২৪
শিক্ষাবর্ষ- ১৯৯৮-৯৯ ইং

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
429860
GIFT
429860

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
জুন-২০০৭।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

M.

429860

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা

অধ্যাপক ডঃ ইউ, এ,বি, রাজিয়া আকতার বানু
তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোঃ মনিরুল ইসলাম ভূইয়া
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃনং : ৪২৪
শিক্ষাবর্ষ- ১৯৯৮-৯৯ ইং

429860

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হইল)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

মো: মনিরুল ইসলাম ভূইয়া

মোঃ মনিরুল ইসলাম ভূইয়া
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ঃ ০১-০৬-২০০৭ ইং

429860

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ডঃ ইউ,এ, বি, রাজিয়া আকতার বানু

অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ ঃ ০১-০৬-২০০৭ ইং

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য "জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা" শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে মোঃ মনিরুল ইসলাম ভূইয়া কর্তৃক রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

আমার জানামতে লেখক এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেন নাই।

আমি এই গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ ইউ.এ.বি. রাজিয়া আকতার বানু

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা

মরহুম আবু বাকার সিদ্দিক ভূইয়াকে

Dhaka University Institutional Repository

সার কথা (Abstract)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক তান্ডবলীলা এবং মানবতার বিপর্যয় থেকে বিশ্বকে মুক্ত করে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুসংহত করার প্রয়াসে আজ থেকে ৬২ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থাটির। মূলতঃ যুদ্ধ ও সংঘাতের বিপরীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৫ সালে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার একটি বিশেষ সংযোজন । উক্ত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের যাত্রাকাল শুরু হয় ১৯৮৮ সাল থেকে । ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধের শেষ দিকে UNIIMOG Peace keeping force এ অংশ গ্রহনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের শুভ সূচনা ঘটে। এর পর থেকে প্রায় সবকটি শান্তি মিশনে বাংলাদেশ অংশ গ্রহণ করেছে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশ গ্রহণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কার্যক্রমের পরিধি খুবই কম। বর্তমান গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে বাংলাদেশের ভূমিকা মূল্যায়ণ করা। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তার ভাবমূর্তি কতটুকু উজ্জ্বল করতে পেরেছে তা বের হয়ে আসবে। নির্ধারিত গবেষণা কর্মে সমগ্র বিশ্বে শান্তি মিশনের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যগনের ইতিবাচক ভূমিকা ও সাফল্যের নানা দিক প্রকাশিত হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা তথা কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভূমিকা, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার লক্ষ্য ও প্রাথমিক অনুমান, গবেষণার গুরুত্ব, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত ধারণাগত পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামোতে শান্তি সম্পর্কিত ধারণা, শান্তি সংরক্ষণ সম্পর্কিত পর্যালোচনা এবং শান্তিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে জাতিসংঘের উৎপত্তিগত ইতিহাস থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের উৎপত্তিগত প্রেক্ষিত, এর লক্ষ্য ও কার্যক্রম, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম স্থাপন, শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি সংরক্ষণ এবং শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচী আলোচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ এবং শান্তিমিশনে বাংলাদেশের যোগদানের প্রেক্ষিত ছাড়াও সংক্ষেপে বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান কাহিনী সম্পর্কে কিছু কথা তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অংশ গ্রহণ থেকে শুরু করে এর নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার বিভিন্ন শান্তি মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সেনাবাহিনীর পাশাপাশি নৌ, বিমান ও বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা সহ শান্তিমিশনে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইরাক ও আফগান অভিযানে কোয়ালিশন বাহিনীতে অংশগ্রহণ না করা এবং লেবাননে শান্তিরক্ষী বাহিনী না পাঠানো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জী ও পরিশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সর্বাধিক। বাংলাদেশ সরকার প্রতি মাসে ১০ মিলিয়ন ডলার জাতিসংঘ শান্তি মিশন থেকে আয় করে থাকে। এই আর্থিক অর্জন বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর আধুনিকায়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের শান্তি রক্ষী বাহিনীর মানবিক ভূমিকা শান্তিমিশনকে একদিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে অপরদিকে তাদের এরূপ ইতিবাচক ভূমিকা যুদ্ধ ও সংঘাতে বিধ্বস্ত দেশের শান্তি ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে আরোও সুসংহত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনেক বাঁধা বিপত্তির পর আমার এই গবেষণা কর্মটির সফল সমাপ্তিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে এক সুখময় আনন্দ অনুভব করছি। যে কোন গবেষণা কর্মে একজন গবেষকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। এই মূহূর্তে অনেকের সহযোগিতার প্রতিদান দেয়া হয়তো অসম্ভব। তবুও কয়েক জনের অবদানের কথা উল্লেখ করে যতটুকু সম্ভব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নষ্ট করতে চাই না।

একজন আদর্শ গবেষক হয়ে সবার জন্ম হয় না। কিন্তু তাকে গবেষক করে তোলেন। বার বার তার কর্তব্য কর্ম-সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন। এই অসামান্য কাজটি আমার জন্য যিনি করেছেন তাঁর প্রতি আমি চির ঋণী, চির কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ ইউ.এ.বি. রাজিয়া আকতার বানু। যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যা আমার জন্য এক বড় প্রাপ্তি। এমন একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিত। আমি আবারও তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক ডঃ আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়া, অধ্যাপক ডঃ এম. নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক এম. সাইফুল্লাহ ভূইয়া সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দকে।

তথ্য সংগ্রহে যিনি আমাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করেছেন, তিনি হলেন আন্ত:বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের সাবেক পরিচালক কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম, পি.এস.সি। যাঁর অবদানের কথা আমি কোন দিনও ভুলতে পারবো না। আমি তাঁর কাছে ঋণী এবং জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

কৃতজ্ঞতা জানাই Young Professional, UNDP, Bangladesh-এর জনাব তারেকুল ইসলাম তারেককে। যার শ্রম, মেধা, আন্তরিকতা ও সহযোগিতার ঋণে আমি ঋণী। আমি আবারও তাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহকর্মী ড. মোঃ নূর আলম সহ আমার কর্মস্থল আফাজ উদ্দিন খান মহিলা ডিগ্রী কলেজের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দকে। এক সময়ের সহপাঠী অধ্যাপক সাইদুর রহমান (বাবু) এবং বন্ধু জনাব হাবিবুর রহমানকে। যারা সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং সেনা সদরের আন্ত:বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও মামা জনাব নাছির উদ্দিন আহম্মেদ সহ আমার মা বেগম মনোয়ারা সিদ্দিকী, স্ত্রী হিরা, ছোট ভাই শামীম সিদ্দিকী এবং একমাত্র সন্তান নাফিস আবদুল্লাহ্ ধ্রুব সহ পরিবারের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আমার এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে আরো যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সবার প্রতি জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে বাঁধাই করা পর্যন্ত যাদের হাতের ছোঁয়া লেগেছে সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সবার প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা

সূচীপত্র

ঘোষণাপত্র..... I

প্রত্যয়ন পত্র..... II

উৎসর্গ III

সারকথা IV

কৃতজ্ঞতা স্বীকার VI

প্রথম অধ্যায় ১-১১

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১.৩ গবেষণার প্রাথমিক অনুমান

১.৪ গবেষণার গুরুত্ব / যৌক্তিকতা

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

১.৬ সাহিত্য পর্যালোচনা

তথ্যপঞ্জী

দ্বিতীয় অধ্যায়..... ১২-১৬

২.০ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ধারণাগত পর্যালোচনা

২.১ শান্তি সম্পর্কিত ধারণা

২.২ শান্তি সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণা

২.৩ শান্তিরক্ষী বাহিনী সম্পর্কিত ধারণা

তথ্যপঞ্জী

তৃতীয় অধ্যায়..... ১৭-৩৬

৩.০ জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

৩.১ জাতিসংঘের উৎপত্তিগত ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

৩.২ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

৩.৩ জাতিসংঘ শান্তি মিশনের উৎপত্তিগত প্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও কার্যক্রম

৩.৪ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কি

৩.৫ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম স্থাপন

৩.৬ শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ

৩.৭ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি সংরক্ষণ

৩.৮ শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচী

তথ্যপঞ্জী

চতুর্থ অধ্যায় ৩৭-৪৬

৪.০ জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

৪.১ জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ

৪.২ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের যোগদানের প্রেক্ষিত

তথ্যপঞ্জী

পঞ্চম অধ্যায়..... ৪৭-৯৬

৫.০ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

৫.১ মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

৫.২ ইরান-ইরাক যুদ্ধ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

ক) UNIIMOG মিশনের সাংগঠনিক ধারণা

খ) UNIIMOG মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

৫.৩ ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ এবং UNIKOM

৫.৪ কুয়েত পূনর্গঠন কার্যক্রম

৫.৫ আফ্রিকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

৫.৬ কঙ্গোতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

৫.৭ মোজাম্বিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

৫.৮ সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী

UNOMSIL থেকে UNAMSIL

সিয়েরা লিওন ও সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং বাংলাদেশ

সিয়েরা লিওনের সর্বত্র ব্যানসিগ

মানবতার সেবায় ব্যানসিগ

ব্যানব্যাট মোতায়েন

ব্যানআর্মি-১ এর সাফল্য

শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

৫.৯ জাতিসংঘ শান্তিমিশন ও বাংলাদেশ নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনী

৫.১০ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

৫.১১ বাংলাদেশ আফগানিস্তান ও ইরাক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের কোয়ালিশন বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেনি

৫.১২ বাংলাদেশ লেবাননে শান্তিরক্ষী পাঠায়নি

তথ্যপঞ্জী

ষষ্ঠ অধ্যায় ৯৭-১০২

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী ১০৩-১০৮

পরিশিষ্ট ১০৯-১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা ঃ

আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জাতিসংঘের ইতিহাসে একটি উদ্ভাবনী চিন্তার ফসল জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে একটি বিশেষ সংযোজন। মূলত: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই জাতিসংঘের কার্যক্রমে শান্তিসংরক্ষণ প্রক্রিয়া ঘনিষ্টভাবে যুক্ত হয়। যখন থেকে শান্তিকামী রাষ্ট্র সমূহ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান রাখতে শুরু করে ঠিক তখন থেকেই এ সম্পর্কিত আলোচনা সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করে। সংঘাতপূর্ণ অবস্থায় একটি বিপদ জনক পরিস্থিতিতে শান্তি সংরক্ষণের মহান প্রয়াসে নিয়োজিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাহসী ভূমিকা সম্পর্কিত আলোচনা সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৫ সালের ২৪ শে অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়[১]। উক্ত সনদের মূল বক্তব্য ছিল জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। উক্ত সনদে জাতিসংঘের অন্যতম শাখা নিরাপত্তা পরিষদকে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করে তার নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হয়।[২] জাতিসংঘ সনদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১.৪২ এবং ৪৩ নং অনুচ্ছেদে নিরাপত্তা পরিষদকে বিবাদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষ নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়।[৩]

Peace keeping বা শান্তিরক্ষা শব্দটি জাতিসংঘ সনদে উল্লেখ নেই।[৪] এটি বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তিরক্ষার জন্য নতুন সৃষ্ট একটি প্রত্যয় হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘ সনদের ৬ নং অধ্যায়ে শান্তি সংরক্ষণ বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় । জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্ব প্রথম শান্তি রক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে।[৫] অবশ্য তার পূর্বে ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইল সাময়িক যুদ্ধ বিরতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) এবং ১৯৪৯ সালে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পর কাশ্মীরে United Nations Military Observer Group (UNMOG) গঠন করা হয়। এদুটাই ছিল পর্যবেক্ষক মিশন। শান্তি মিশনটি ১৯৫৬ সালে মিশরের সিনাইতে পরিচালিত হয় যা UNEF বা জাতিসংঘ জরুরী ফোর্স নামে পরিচিত। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ৬১ টি শান্তিরক্ষা কার্যক্রম জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। তন্মধ্যে ৪৬টি মিশন শেষ হয়েছে এবং বাকীগুলো চলমান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশ গ্রহণ করে আসছে। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী বৃহৎ আকারে অংশ গ্রহণ করলেও এর পাশাপাশি বিমান, নৌ ও পুলিশ বাহিনী শান্তি মিশনে সক্রিয় ভাবে অবদান রেখে চলছে। জাতিসংঘে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ-সংখ্যক সৈন্য প্রেরণকারী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত । ১৯৮৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত (নভেম্বর ২০০৬) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ৩১ টিতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে।[৬]

মূলত: বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী দুটি পর্যায়ে এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে। প্রথম পর্যায় বলতে পর্যবেক্ষক মিশণকে বোঝানো হয়েছে। উক্ত পর্যায়ে বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ কোন গ্রুপ বা দলবদ্ধ না হয়ে ব্যক্তিগত ভাবে বহুজাতিক গ্রুপে অংশ গ্রহণ করে। তারা সামরিক পর্যবেক্ষক (MILOBS) নামে পরিচিত। সামরিক পর্যবেক্ষক গণ কোন অস্ত্র শস্ত্র বহন না করে সংঘাত পূর্ণ এলাকায় বেসামরিক লোকের ন্যায় কাজ করে। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী একটি কোম্পানী বা ব্যাটালিয়ন এর মাধ্যমে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে। তাদেরকে Contingent members বলা হয়। এরা সাধারনত শান্তিরক্ষী বাহিনী নামে পরিচিত। তারা অস্ত্র বহন করে এবং শান্তি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ।

উক্ত গবেষণায় উভয় প্রকার অংশ গ্রহণের আলোকে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলছে। বাংলাদেশের শান্তি বাহিনীর ইতিবাচক ভূমিকা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিকে অধিকতর কার্যকরী করতে ভূমিকা রাখছে। শান্তি মিশন থেকে বাংলাদেশের অর্জন ব্যাপক । একদিকে যেমন তাদের ইতিবাচক ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভূমিকা ও ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে তেমনি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রেখে চলছে। শান্তি মিশনে শান্তি রক্ষীগণ নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সংঘাত পূর্ণ অবস্থানে নিয়োজিত থাকে। তৃতীয় পক্ষ বলতে এখানে মধ্যস্থতাকারী বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে যারা জাতিসংঘের অধীনস্থ থেকে সংঘাতে জড়িত দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত নিরসনে ভূমিকা রাখে।[৭] উক্ত গবেষণা কর্মে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো শান্তি বাহিনীর দায়িত্ব ও তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা কর্ম সম্পাদনে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ করে জাতিসংঘে বাংলাদেশের কার্যকরি ভূমিকার গতি প্রকৃতি, বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সফলতা, বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান, আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি সহ পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা সম্পর্কিত বিশদ ব্যাখ্যা প্রদানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রতিটি গবেষণারই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। একেকজন গবেষক একেকটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। বস্তুতপক্ষে গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় বা সমস্যার সমাধানে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। আলোচ্য গবেষণা কর্মটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের উৎপত্তিগত ইতিহাস উপস্থাপন করা।

(খ) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের যোগদানের প্রেক্ষিত বর্ণনা করা।

(গ) যেসকল মিশনে বাংলাদেশের শান্তি বাহিনী অংশগ্রহণ করেছে সেসব মিশনের সফলতা ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা।

(ঘ) শান্তিরক্ষা, পূর্ণগঠন এবং মানবিক কাজে বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করা।

(ঙ) শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি বাস্তবায়নে ইতিবাচক প্রভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির মাত্রা নিরুপন করা।

(চ) শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে বাংলাদেশের শসস্ত্র বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতার কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তা যাচাই করা।

(ছ) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা কিভাবে আরোও অধিকতর কার্যকরী করা সম্ভব তা ব্যাখ্যা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৩ গবেষণার প্রাথমিক অনুমান ঃ

(ক) জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে কার্যকরী ও ফলপ্রসু ভূমিকা রেখে আসছে।

(গ) বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা-আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশটির ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করেছে।

(ঘ) জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশগ্রহণের ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তাদের উপার্জন ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

(ঙ) জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সফল ভূমিকা এদেশের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য অর্জনে অনেকাংশে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

১.৪ গবেষণার গুরুত্ব/ যৌক্তিকতা ঃ

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতি সংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের গুরুত্ব অপরিসীম । জাতি সংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের সময়কাল ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু। সুদীর্ঘ ১৯ বছর অতিক্রম হওয়ার পরও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ সম্পর্কিত কোন মৌলিক গবেষণা কর্মের উপস্থিতি তেমন লক্ষ্য করা যায় না। অথচ বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর ইতিবাচক ও বীরোচিত ভূমিকার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে, বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য বাস্তবায়ন অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে । সুদীর্ঘ ১৯ বছর যাবত বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশের সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সফলতা, সীমাবদ্ধতা ও তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত গবেষণাকর্ম অতিব জরুরী। কেননা শান্তি মিশন সম্পর্কিত আলোচনা সমগ্র বিশ্বে পরিলক্ষিত। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের পর এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় জাতি সংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিরোধপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার সংঘাত কিংবা জাতিগত দাঙ্গা নিরসনের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় যে ব্যাপক ভূমিকা তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতি বিজ্ঞানে গবেষণা ও অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তাই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় শান্তি বাহিনীতে বাংলাদেশের অবদান যে গুরুত্বপূর্ণ তা সম্পর্কিত

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা যৌক্তিক ও নতুনত্বের দাবী রাখে। উক্ত বিষয়ে সম্পাদিত গবেষণা কর্মের দ্বারা নিরাপত্তা বিশ্লেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও রাজনীতিক বিজ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ এবং বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকগণ-উপকৃত হবেন। এই গবেষণার সূত্র ধরে নবীন কোন গবেষকও গবেষণায় উৎসাহিত হতে পারে।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং নতুন সত্যের সন্ধান লাভ করার প্রচেষ্টা । অর্থাৎ মানুষের আত্ব জিজ্ঞাসার একটি সুনিশ্চিত রূপ হচ্ছে গবেষণা। আলোচ্য গবেষণাটির মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশ গ্রহণের বিষয়টি গভীর থেকে উদঘাটিনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের শান্তি মিশনের অধীনে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীদের পাশাপাশি আমাদের দেশের শান্তিরক্ষীদের প্রকৃত পরিস্থিতি উন্মোচনে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপোযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মটিতে তথ্য সংগ্রহে মাধ্যমিক (Secondary) উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্লেষণ ধর্মী এবং বর্ণনা মূলক গবেষণার যে কৌশল তাও এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য উৎস ব্যবহার করতে গিয়ে এ সম্পর্কিত পূর্বে যে সকল গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে সেসব উৎস, সংশ্লিষ্ট বিষয়ক বিভিন্ন জার্নাল, বই , সরকারি নথিপত্র, দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা, এবং ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির সর্বক্ষেত্রেই পরিমাণের চেয়ে গুণের উপর অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

১.৬ সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত সাহিত্যের উপস্থিতি তেমন লক্ষ্যনীয় নয়। বর্তমানে বিশ্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা ইস্যুটি সংকট ও সংঘর্ষ নিরসনে অতি পরিচিত। এ বিষয়টি সময়ের পরিক্রমায় যথেষ্ট গতিশীল । তাই এ সম্পর্কিত মৌলিক সাহিত্য কর্মের উপস্থিতি তেমন চোখে পড়েনা। বিশেষত জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা শীর্ষক প্রকাশনা তেমন বেশি নেই। উক্ত গবেষণা কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

Arthur Lee Burns এবং Nina Heathcote তাদের "Peace Keeping by UN Forces From Suez to the Congo"[৮] শীর্ষক গ্রন্থে লেখকদ্বয় জাতিসংঘের শান্তি সংরক্ষন এর

Dhaka University Institutional Repository

উৎপত্তিগত ইতিহাস এবং শান্তিরক্ষা মিশনের সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করেন। তারা শান্তিরক্ষা মিশনের সফলতার পিছনে দুটি কারণ নিহিত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তন্মোধ্যে একটি হলো জাতি সংঘের শান্তি সেনাদের দক্ষতা, উৎকর্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং অপরটি হলো জাতিসংঘকে সংঘর্ষ নিরসনে বিশ্ব সংস্থা হিসেবে বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি।[৯] উক্ত গ্রন্থে লেখকদ্বয় বেশকটি অধ্যায়ে সুয়েজ খাল থেকে শুরু করে কংগো সংকট নিরসনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার সফলতা ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। এসব ছাড়াও উক্ত গ্রন্থের শেষ দিকে জাতি সংঘ মিশন সম্পর্কে বৃহৎ শক্তির মনোভাব ও তাদের প্রভাব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Michacel Harbottle তার "The Impartial Soldier"[১০] শীর্ষক গ্রন্থে শান্তিরক্ষীগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল সমস্যা ও প্রতিকূলতার সম্মখীন হয় তা বর্ণনা করেছেন। লেখক উক্ত গ্রন্থে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীদের নিরপেক্ষতাকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা সহ তাদের সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করেন। পাশাপাশি শান্তি মিশনকে সফল করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে বিবাদমান গ্রুপ গুলোকে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার আওতায় নিয়ে আসতে নিরপেক্ষ সৈনিকদের কৌশল ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াগুলো উক্ত গ্রন্থে লেখক চকৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তিনি সুয়েজ খালকে ঘিরে যে শান্তিরক্ষি বাহিনীর উদ্ভব তা ব্যাখ্যা প্রদান করা ছাড়াও শান্তি রক্ষী বাহিনীর সীমাবদ্ধতা এবং এ ক্ষেত্রে জাতি সংঘের বৃহৎ তথা ভেটো ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

James M. Boyd তার "United Nations peace keeping Operations : A Military and Political Appraisal"[১১] শীর্ষক গবেষণা কর্মে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং এ ক্ষেত্রে ভূমিকার বিষয়টি বর্ণনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত শেষ হয়ে যাওয়া শান্তি মিশনগুলোকে Case Study আকারে উপস্থাপন করে শান্তি রক্ষী বাহিনীর সংঘর্ষ নিবারণ সহ সমঝোতার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকা কিরূপ হয়েছিল তা বর্ণনা করেন। পাশাপাশি তিনি শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা কে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র কিভাবে প্রভাবিত করে তা তুলে ধরেছেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কিভাবে একটি দেশের বৈদেশিক নীতির সাথে সম্পর্কিত তা মূল্যায়ন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Larry. L Fabian তার "Soldiers without Enemy : Preparing the United Nations for Peacekeeping"[১২] শীর্ষক গ্রন্থে জাতিসংঘের শান্তি মিশনের কতিপয় দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন । কিভাবে জাতিসংঘকে অধিকতর শক্তিশালী করে শান্তিরক্ষা মিশনগুলো আরোও বেশি কার্যকর ও সফল করা সম্ভব তিনি এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেন । লেখক জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর মানবিক এবং বস্তুগত সম্পদের অপ্রতুলতার চিত্র তুলে ধরেন । এ থেকে বৃহৎ শক্তিগুলো কৃত্রিম সংকট তৈরিতে ভূমিকা রাখছে তা তিনি আবিষ্কার করেন । তিনি এ গ্রন্থে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে বড় বড় শক্তির নেতিবাচক ভূমিকার সমালোচনা করেন ।

Major General Jit Rikhye, Brigadier General M Harbottle এবং Major general B Egge সম্পাদিত "The Thin Blue Line : International Peace Keeping and its future"[১৩] শীর্ষক গ্রন্থে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় শান্তি বাহিনীর রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং আর্থিক বিষয়াদির গুরুত্ব কি তা ব্যাখ্যা করেন । জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এ তিনটি দিক থেকে নানা প্রতিকূলতার বৃত্তে আবদ্ধ বলে লেখকগণ উল্লেখ করেন । ভবিষ্যত শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক জটিলতা নিরসনে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করা হয় উক্ত গ্রন্থে । সর্বশেষ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সীমাবদ্ধতার কথা ও উল্লেখ করা হয় ।

C.C Moskos Jr তার "Peace Soldiers : The Sociology of a United Nations Military Force"[১৪] শীর্ষক গ্রন্থে শান্তি সংরক্ষণকে দুটি প্রত্যয়ের সাহায্যে উপস্থাপন করেন । তন্মধ্যে একটি হলো বল প্রয়োগ মুক্ত শান্তি সংরক্ষণ নীতি এবং অপরটি হলো নিরপেক্ষতা ও শান্তি চর্চা । বল প্রয়োগ না করে শান্তি সংরক্ষণে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সীমাবদ্ধতা Case Study আকারে উপস্থাপন করেন । লেখক বহুজাতিক বাহিনীর গঠন কাঠামো আর্থিক সুবিধা এবং শান্তি মিশন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন ।

Antonio Cassese সম্পাদিত "United Nations Peace keeping : Legal Essays"[১৫] শীর্ষক গ্রন্থে শান্তি মিশনে যৌক্তিক সমস্যা সমূহ কিভাবে শান্তি সংরক্ষনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা তিনি চিহ্নিত করেছেন । তার এ গ্রন্থটির পুরো অংশ জুড়েই শান্তি সংরক্ষনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ রাজনীতির প্রভাব এবং বিরোধ পূর্ণ গ্রুপ বা রাষ্ট্রের মধ্যে যে শীতল সম্পর্ক তা শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি কিরূপ হুমকিস্বরূপ তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

Henry Wiseman সম্পাদিত "Peacekeeping Appraisals and proposals"[১৬] শীর্ষক গ্রন্থে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি এ গ্রন্থে প্রাথমিক পর্যায়ের শান্তি মিশনের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সাথে বর্তমান সময়ের শান্তি মিশনগুলোর মধ্যকার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতার পিছনে কি কি কারণ দায়ী তা উল্লেখ করেছেন । তিনি বিভিন্ন দশকে অনুষ্ঠিত শান্তি মিশনগুলোর মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনা এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেন। পরিশেষে লেখক শান্তি রক্ষাকে কার্যকরী ও সফল করতে পরাশক্তির মধ্যকার সুসম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

IJ Rikhy তার " The Theory and practice of peacekeeping"[১৭] শীর্ষক গ্রন্থে শান্তি সংরক্ষণের গতি প্রকৃতি এবং জাতিসংঘ কিভাবে শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন করে এবং শান্তি মিশনে আর্থিক সমর্থনের বিষয় উপস্থাপন করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে শান্তি রক্ষা ও শান্তি বাহিনী সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা কিভাবে একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত তা বর্ণনা করেন।

লেখক উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সংঘাত পুর্ন অবস্থা, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাঠামোগত দিক নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

Alm James তার Peacekeeping in International politics"[১৮] শীর্ষক গ্রন্থে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম কিভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে তার বর্ণনা দেন। লেখক এক্ষেত্রে শান্তি সংরক্ষনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল ক্রীড়ানকগণের ভূমিকা মূল্যায়ন করেন। তিনি নিরাপত্তা ও শান্তি সংরক্ষন অধ্যয়নকে ব্যাপক ভিত্তিক মৌলিক গবেষণা কর্মে সংযুক্ত করে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা আবিষ্কারের কথা বলেন। লেখক উক্ত গ্রন্থে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় নিরাপত্তা পরিষদ ও শান্তিকামী দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক অবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৯]

William J. Durch সম্পাদিত "The Evolution of UN Peace keeping"[২০] শীর্ষক রচনায় তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংকট সমূহ বিশেষ করে সুয়েজ খাল সংকট কিভাবে আন্ত র্জাতিক রাজনীতির মেরুকরনে ভূমিকা রেখে ছিল এবং এই সমস্যা থেকেই জাতিসংঘ শান্তিমিশনের যে যাত্রাকাল তা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। লেখন স্নায়ুযুদ্ধের সময় শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সফলতা ও

Dhaka University Institutional Repository

সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি তৃতীয় পার্টির হস্তক্ষেপের নানা দিক উপস্থাপন করেন এ গ্রন্থে।[২১]

জাতিসংঘের শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের ভূমিকা শীর্ষক তেমন কোন মৌলিক প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। T.A Zearat Ali রচিত "Bangladesh in United Nations Peacekeeping operations"[২২] শীর্ষক রচনায় তিনি An Agenda for Peace এবং An Agenda for Development[২৩] প্রভৃতি বিষয়কে আলোচনার প্রারম্ভে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীর সাহসী ভূমিকার কথা উপস্থাপন করেন।[২৪] তিনি উক্ত গ্রন্থে বাংলাদেশের সফলতার কাহিনী বর্ণনা করলেও বাংলাদেশের শান্তিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে আর্থিকভাবে বাংলাদেশ লাভবান হয়েছে কিংবা বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য বাস্তবায়নে কিভাবে ভূমিকা রাখছে তা সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা দেননি। তিনি পরিশেষে শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়ঃ তথ্যপঞ্জী

১। Basic Facts About the United Nations,
Department of Public Information, United Nations,
New York, 1992, p-4

২। মুখোপাধ্যায় শক্তি ও মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রানী, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি", দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭-এ কলেজ স্ট্রীট; কলিকাতা-৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল জুন-১৯৯২ ইং, পৃঃ ৩০০।

৩। জাতিসংঘ সনদ, সপ্তম অধ্যায়, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, অক্টোবর, ২০০১ পৃঃ ১৯,২০।

৪। মুখোপাধ্যায় শক্তি ও মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রানী,
পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৪

৫। Journal of International Relations, Vol, I, No-2 January-June-1994, Department of International Relations, University of Dhaka, 1994, p-52

৬। হোসেন তোফাজ্জলঃ জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ বইমেলা-২০০৭, পৃঃ ৫২৮।

৭। Inis Claude, " The Peace-keeping Role of the U.N" in "The U.N in perspective" edited by E. Berkeley Tompkings, p-53

৮। Al Burns & N Heathcote, Peace-keeping by UN Forces: From Suez to the Congo, Pall Mall Press, New York, 1963

৯। Ibid, p-VIII

১০। M. Harbottle, The Impartial Soldier, Oxford University Press, London, 1970.

১১। J. M. Boyd, United Nations Peace-keeping Operations : A Military and Political Appraisal, Praeger Publishers Inc, NY,1971.

১২। LL.Fabian, Soldiers Without Enemy, Preparing the United Nations for peace-keeping, the Brookings Institution, Washington D.C.1971.

১৩। IJ Rikhye, M Harbottle, B. Egge, The Thin Blue Line: International Peace-keeping and its future, Yale University press, New Haven, 1974.

Dhaka University Institutional Repository

১৪। C.C. Moskos. Jr, Peace Soldiers: The Sociology of a United Nations Military Force, University of Chieago press, Chieago, 1976.

১৫। A Cassese ed; United Nations Peace-keeping: Legal Essays, Sijthoff & Noordhoff International Publishers BV, The Netherland, 1978.

১৬। H Wiseman ed; Peace-keeping: Appraisals and proposals, pergamor Press, New York, 1983

১৭। IJ Rikhye, The Theory & Practice of Peace keeping, C Hurst & company for IPA, London, 1984.

১৮। A James, Peace keeping in International Politics Mac Millan Academic and Professional Ltd, London, 1990.

১৯। Ibid, pp-1-8

২০। WJ Durch, ed, The Evolution of UN Peace keeping: Case studies & comparative Analysis, st, Martins Press, New York, 1993.

২১। Ibid, p-12

২২। Ali Zearat T.A, "Bangladesh in United Nations Peace keeping Operations, BIISS Papers-16, July 1998, published by : Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), Dhaka, Bangladesh.

২৩। Ibid, pp-15-16

২৪। Ibid, pp-36-78

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.০ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ধারণাগত পর্যালোচনা

২.১ শান্তি সম্পর্কিত ধারণা

শান্তি হলো একটি বিমূর্ত ধারণা। শান্তি সম্পর্কিত ধারণাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ । এ ধারণাটি নানা প্রত্যয়ে পরিচিত । এর সাথে নিরাপত্তা, স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, মুক্তি, স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, মানসিক পরিতৃপ্তি প্রভৃতি বিষয় জড়িত । পবিত্র ধর্ম ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্মে শান্তিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে যে ইসলাম শান্তির ধর্ম [১] এবং ইসলাম জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শান্তি ও সম্প্রীতি অটুট রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ইসলামে এও বলা হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলাম ধর্মের মূল লক্ষ্য এবং শান্তিকে বেহেশতের নিয়ামক বলে অভিহিত করা হয়।[২]

শান্তি এমন একটি পন্থা যা সংকট নিরসনের মধ্যমে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ নিশ্চিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। শান্তি যুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, মতবিরোধ ও দুর্যোগ এর ঠিক বিপরীতমূখী একটি ধারণা। এটি দেশ, সমাজ, জাতি, অঞ্চল নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক কল্যাণ ও সম্প্রীতি বিনির্মাণের জন্য একটি মন্ত্র।[৩]

শান্তি সম্পর্কিত ধারণাটির প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা না গেলেও একথা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ শান্তি প্রাপ্তির জন্য মানব জাতিকে আহবান জানিয়ে আসছে। যুগে যুগে আধ্যাত্মিক নেতাগণ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ সহ অন্যান্য ধর্মীয় মনীষী ও ধর্ম গ্রন্থ বিশ্ব শান্তির জন্য মহান বাণী প্রচার করে যাচ্ছে।[৪] খ্রীষ্টান ধর্ম , হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মে মানব সেবা, মানব কল্যান এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানকে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

মনীষী Aristotle শান্তি সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তা উল্লেখ করার মতো । তিনি মনে করতেন বিশ্বের জনগণ যে একে অপরের সাথে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত তার পিছনে যুক্তি হলো তারা শান্তি সংরক্ষণ করে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজে বা বিশ্ব পরিমন্ডলে বসবাস করতে চায়।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

St. Thomas Aquinas শান্তি সম্পর্কে যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সংগা দিয়েছেন তা হলো- সম্প্রদায়গুলো একটি মাত্র লক্ষ্য কে সমানে রেখে একটি অভিন্ন ইউনিটে পরিণত হতে পারে তা হলো শান্তি সংরক্ষণ করা। একমাত্র শান্তি সংরক্ষণ করার দৃঢ় প্রত্যয় পারে সকলের তথা দেশ, সমাজ ও বিশ্বে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি নির্ভর সহ বসবাস নিশ্চিত করতে।[৬]

দার্শনিক রুশো যুদ্ধকালীন সময়ে রাষ্ট্রের যথাযথ ভূমিকা যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সহায়ক শক্তি তা ব্যক্ত করেছেন । তিনি General will কে ও শান্তির বার্তা বলে মন্তব্য করেন।

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্র চিন্তাবিদ উড্রো উইলসন গণতন্ত্রকে শান্তির মূল উৎস বলে মন্তব্য করেন।[৭] তিনি এ প্রসংগে বলেন শান্তি হলো জনগণের স্বাধীনতার রক্ষা কবচ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শান্তি প্রতিষ্ঠায় যথার্থ ভূমিকা রাখে বলে তিনি মনে করেন। গণতন্ত্রের পূর্ব কথা হলো পরমত সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান, স্বাধীনতা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ যা শান্তির সমার্থক।

William Penn শান্তিকে নিরাপত্তার মূল স্তম্ভ বলে অভিহিত করেন। তিনি শান্তিকে জনগণের সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করেন।[৮] তিনি শান্তিকে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখন্ডতার জন্য নিয়ামক বলে অভিহিত করেন।

সর্বোপরি শান্তি হলো একটি বিমূর্ত ধারণা যে ধারণাটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল প্রান্তে বসবাসরত জনগণের মধ্যকার সমতা, আন্তঃযোগাযোগ, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনকে বুঝায় ।

Dhaka University Institutional Repository

২.২ শান্তি সংরক্ষন সম্পর্কিত ধারণা ঃ

শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত ধারণা একটি বহুল প্রচলিত ধারণা । কেননা শান্তি সম্পর্কিত ধারণার সাথে শান্তি সংরক্ষণ বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শান্তি ও শান্তি সংরক্ষণ বিষয় দুটি অভিন্ন বিষয় । শান্তি সংরক্ষণ বিষয়টি সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে। সে সময় থেকে আজ অবধি সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্বমন্ডল শান্তি সংরক্ষণকে স্ব স্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাতি রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন জোট করে বা আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে তোলে, কিংবা দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলে অথবা তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে শান্তি সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৯] দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর পরই জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদের ২৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে জাতি সংঘ যাতে দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য এর সদস্যগণ নিরাপত্তা পরিষদের উপর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব অর্পন করেছে।[১০]

জাতিসংঘ সনদের ৩৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, যে কোন বিরোধের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে বা হওয়ার আশংকা দেখা দিলে বিরোধের সাথে জড়িত সকল পক্ষের প্রাথমিক কাজ হলো আলোচনা, অনুসন্ধান, মধ্যস্থতা, সালিশী ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ওই বিরোধের মীমাংসা করা।[১১] তাছাড়া আঞ্চলিক সংস্থা বা ব্যবস্থাদির মাধ্যমে বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী কোন শান্তি পূর্ণ পথে ওই বিরোধের মীমাংসা করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ যেকোন বিরোধ মীমাংসা করলে উভয় পক্ষকে আহবান জানাতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদ যে কোন বিরোধের বিষয়ে অথবা সংঘর্ষ বা বিরোধ সৃষ্টিকারী কোন পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত করতে পারে । শান্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ এবং আগ্রাসন মূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার নিরাপত্তা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। সনদের সপ্তম অধ্যায়ের ৩৯-৫১ ধারায় ওই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা সংযোজিত আছে। ৩৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে শান্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন, শান্তিভঙ্গ ও আগ্রাসন মূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে কিনা নিরাপত্তা পরিষদ তা স্থির করবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ সনদের ৪১ ও ৪২ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৪০ ধারা মোতাবেক সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক, রেল,

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্র, বিমান, ডাক, টেলিগ্রাফ, রেডিও এবং অন্যান্য সংযোগ সাধনের মাধ্যম ছিন্ন করা এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার অন্তভূক্ত।

৪২ ধারা মোতাবেক নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বা শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। জাতিসংঘ সনদের ৪৩,৪৪ ও ৪৭ ধারা মতে, আন্তর্জাতিক শান্তি সংরক্ষনে বা পূর্ণ স্থাপনে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করে বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে প্রেরণ করবে।[১২] সর্বোপরি জাতিসংঘ কর্তৃক শান্তি সংরক্ষণ কার্যক্রম সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে বদ্ধ পরিকর।

২.৩ শান্তিরক্ষী বাহিনী সম্পর্কিত ধারণা

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশ্বের কতিপয় বিরোধপূর্ণ এলাকায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। শান্তিরক্ষী বাহিনী দক্ষ, অভিজ্ঞ চৌকস ও সুশৃংখল সামরিক বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক বাহিনী যারা জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং যারা নিরাপত্তা পরিষদের শান্তি সংরক্ষণ নীতি অনুসারে বিরোধপূর্ণ এলাকায় বিরোধ মীমাংসার মাধ্যমে শান্তি সংরক্ষণ কিংবা শান্তি পূণ:প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে। এই সব শান্তিরক্ষী বাহিনী সরাসরি জাতিসংঘ মহাসচিবের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে। জাতিসংঘ সনদের ৪৩,৪৪,ও ৪৭ ধারা অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উত্তেজনার প্রসার, আন্ত:রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ এবং কোন কোন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন সমস্যা সমাধানের জন্য শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন এবং নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠন ও প্রেরণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্যদের অনুমোদন প্রয়োজন। শান্তিরক্ষী বাহিনী কোন বিরোধপূর্ণ স্থানে বা অঞ্চলে প্রেরণ করতে হলে তিনটি শর্ত পুরণ করতে হবে। প্রথমত: যে দেশে শান্তি বাহিনী প্রেরণ করা হবে সে দেশের সম্মতি থাকতে হবে, দ্বিতীয়ত: নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং তৃতীয়ত: জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের শান্তিবাহিনীতে স্বেচ্ছামূলকভাবে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হবে।[১৩] সর্বোপরি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মূলত নিরস্ত্রক পরিদর্শক অথবা হালকা অস্ত্রে সজ্জিত সেনা বাহিনী হিসেবে মোতায়েনকৃত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ তথ্যপঞ্জী

১। পবিত্র কোরআন, সুরা আল আ'রাফ, পারা ৮-৯, আয়াত ৪৬

২। পবিত্র কোরআন, সুরা আল মরিয়ম, পারা-১৬, আয়াত-৬২

৩। পবিত্র কোরআন, সুরা ইউনুছ, পারা-১১, আয়াত-১০ ও সুরা ইব্রাহীম, পারা-১৩, আয়াত-২৩।

৪। পবিত্র কোরআন, সুরা আল তাওবাহ, পারা-১০-১১, আয়াত-২৬ ও সুরা ইয়াসীন, পারা-২২-২৩, আয়াত ৫৮।

৫। 'The christian Wiew; in E Luard, ed, Basic Texts in International Relations: The Evolution of Ideas about International Society, Mac Millan Press Ltd, London, 1992, p-26.

৬। Quoted from St. Thomas Aquinas, The Duty of Rulers in Peace and War in E Luard, ed, Ibid, p-29-30, as Quoted by him from T Aquinas, De Regimine Principum, XV, and Summa Theologica, XV, trs, J.G, Dawson, Basil Black Well, Oxford, 1978.

৭। KN Waltz, "Man, The State and the Society of States", in E Luard,ed, ibid, p-365

৮। W Penn, An Essay Towards the present and future Peace of Europe (1993), as quoted in E Luard, ed, ibid, p-35

৯। T Schelling, The Strategy of Conflict, Center for International Affairs, Harvard University Press, 1980, p-29.

১০। জাতিসংঘ সনদ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০১, পৃঃ ১৩,১৪।

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭

১২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯-২৩

১৩। হোসেন তোফাজ্জল, "জাতিসংঘ", আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০ জাতিসংঘ ও শান্তিরক্ষা কার্যক্রম

৩.১ জাতিসংঘের উৎপত্তিগত ইতিহাস ঃ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে লীগ অব নেশন্‌স বা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের জাতিসংঘের মত এরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি বজায় রাখা। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত সকল জাতি এই লীগ অব নেশন্‌স-এ যোগদান করেনি। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্র কখনো লীগ এর সদস্য হয়নি। যদিও লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। অনেকে যোগদান করেও পরে সদস্যপদ পরিত্যাগ করেছে। অথবা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হয়নি। নিজস্ব সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার কোন ক্ষমতা লীগ এর ছিল না। লীগ এর ব্যর্থতা বিরোধের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। যার পরিণতিতে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। লীগ নিজস্বভাবে ব্যর্থ হলেও এটি একটি বিশ্ব সংগঠনের স্বপ্নের সূচনা করে যার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের আবির্ভাব ঘটে।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) এক বেদনা বিধুর সময়কালে জাতিসংঘের ধারণা জন্ম লাভ করে। যে যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং আশ্রয়হারা হয় আরো লক্ষ লক্ষ লোক। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় নগরীগুলো। যুদ্ধ থামাতে যে সকল বিশ্ব নেতৃত্ব একজোট হন তারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এক ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বন্ধের অনুভব করেন। তারা অনুধাবণ করেন যে, এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন সকল জাতি একটি বিশ্ব সংগঠনের অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে। জাতিসংঘ হলো সেই ভাবী সংগঠন[২] জাতিসংঘ রাতারাতি তৈরী হয়নি। বহু বছরের পরিকল্পনার পরে সংগঠনটি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এটা ঘটেছে এভাবেঃ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট আটলান্টিক মহাসাগরের এক রনতরীতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল এক গোপন বৈঠকে যোগদান শেষে বিশ্ব শান্তির নিমিত্তে একটি পরিকল্পনার ঘোষনা দেন। তারা এই পরিকল্পনাকে আটলান্টিক সনদ হিসেবে আখ্যা দেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী ২৬টি দেশের প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটন ডিসিতে মিলিত হয়ে জাতিসংঘ ঘোষনায় স্বাক্ষর করেন। তারা আটলান্টিক সনদ মেনে নেন এবং যুদ্ধ বন্ধের শপথ করেন। ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের প্রস্তাবিত জাতিসংঘ নামটি তখন থেকেই সরকারীভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।[৩]

১৯৪৩ সালের অক্টোবরে চীন, সৌভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মস্কোতে মিলিত হন এবং যুদ্ধ পরবর্তী শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসমূহের একটি সংগঠন গঠনের ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌছান। এই চুক্তিনামা মস্কো ঘোষনা নামে পরিচিত।[৪]

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকসে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের জন্যে প্রথম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয় এবং সংগঠনের খসড়া সংবিধান তৈরী করা হয়। চীন, ফ্রান্স, সৌভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।[৫]

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সৌভিয়েত নেতা যোসেফ স্ট্যালিন সৌভিয়েত ইউনিয়নের ইয়াল্টাতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে তারা নিরাপত্তা পরিষদে ভোট গ্রহণ পদ্ধতির ব্যাপারে সম্মত হন। তারা সানফ্রান্সিসকোতে একটি সম্মেলন আয়োজনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল থেকে ২৬শে জুন ব্যাপী অনুষ্ঠিত সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে বিশ্বের ৫০টি দেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। খসড়া করার পর ২৬শে জুন তারা সর্ব সম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সনদ এবং নব্য আন্তর্জাতিক আদালত এর আইন-কানুন অনুমোদন করেন। পোল্যান্ড সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও প্রথম স্বাক্ষরকারী ৫১টি দেশের একটিতে পরিনত হয়।[৬]

আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের জন্ম হয়। ২৪শে অক্টোবর জাতীয়তাবাদী চীন, ফ্রান্স,সৌভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সহ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন করে এবং একে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৭] সেই থেকে ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ জন্মদিনকে সারা বিশ্ব জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে।[৮] জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হবার পর অনেক

Dhaka University Institutional Repository

উপনিবেশিক দেশ স্বাধীনতা লাভ করে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করেছে। যার ফলে জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরকারী সদস্যের সংখ্যা বেড়েছে।[৯]

বিশ্বের স্বাধীন দেশ সমূহেব একটি অদ্বিতীয় সংগঠন হলো জাতিসংঘ যেখানে বিভিন্ন দেশ বিশ্বশান্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্যে কাজ করতে স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে যোগদান করেছে।

বর্তমানে ১৯২টি দেশ নিয়ে গঠিত জাতিসংঘ এক অনন্য সংগঠন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান, জাতিসমূহের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, সামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংগঠনটি জন্ম লাভ করে। জাতিসংঘ তার সনদের আদর্শ দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিত করে রেখেছে। জাতিসংঘ সনদ এমন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি যাতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রগুলোর অধিকার এবং কর্তব্য সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।[১০]

সকল শান্তিকামী রাষ্ট্রের জন্যই জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করার দরজা খোলা রয়েছে। যে কোন দেশ জাতিসংঘের আইন-কানুন মেনে এর সদস্য পদ লাভ করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের সম্মতি সহ সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে একটি রাষ্ট্র এর সদস্যপদ লাভ করে থাকে।[১১] জাতিসংঘ সনদের ৩,৪,৫ ও ৬ নং ধারায় সংস্থার সদস্যপদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছেঃ

ধারা-৩ঃ যে সব রাষ্ট্র সানফ্রান্সিসকোতে আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলনে যোগদান করে অথবা ১৯৪২ সালের ১ জানুয়ারীর জাতিসংঘ ঘোষনাতে পূর্বেই স্বাক্ষর দেয় তারা যদি বর্তমান সনদে স্বাক্ষর রাখে এবং ধারা ১১০ অনুযায়ী তা অনুমোদন করে, সেক্ষেত্রে সে সব রাষ্ট্র জাতিসংঘের মূল সদস্য হিসেবে গন্য হবে।

ধারা-৪ ঃ

১. বর্তমান সনদে উল্লিখিত সমুদয় দায়দায়িত্ব যারা গ্রহণ করবে এবং সংগঠনটির বিচারে যারা এসব দায়দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক সেরূপ অন্য সকল শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রের জন্য জাতিসংঘের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

২. নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এরূপ রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-৫ঃ

জাতিসংঘের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রতিরোধকমূলক অথবা বল প্রয়োগ মূলক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ তার সদস্য পদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ ঐসব অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের ক্ষমতা প্রত্যর্পন করতে পারবে।

ধারা-৬ঃ

বর্তমান সনদে উল্লেখিত মূলনীতিসমূহ ক্রমাগত ভঙ্গের জন্য দায়ী জাতিসংঘের কোন সদস্যকে নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ সংগঠনটি থেকে বহিস্কার করতে পারবে।[১২]

৩.২ জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

জাতিসংঘ সনদের ধারা ১-এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও ধারা ২-এ সংগঠনের মূলনীতিগুলো তুলে ধরা হয়েছেঃ

ধারা-১ঃ জাতিসংঘের উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ

১. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং এতদুদ্দেশ্যে শান্তি ভঙ্গের হুমকী নিবারণ ও দূরীকরণের জন্য এবং আক্রমন অথবা অন্যান্য শান্তি ভঙ্গকর কার্যকলাপ দমনের জন্য কার্যকর যৌথ কর্মপন্থা গ্রহণ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক বিরোধ বা শান্তি ভঙ্গের আশংকাপূর্ণ পরিস্থিতির নিস্পত্তি বা সমাধান ;

২. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির ভিত্তিতে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের প্রসার এবং বিশ্বশান্তি দৃঢ় করার জন্য অন্যান্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ ;

৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা মানবিক বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ সাধন এবং মানবিক অধিকার ও জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মৌল স্বাধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে উৎসাহ দান ; এবং

৪. এইসব সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জাতিসমূহের প্রচেষ্টায় সমন্বয় সাধনের কেন্দ্র হিসেবে কার্য পরিচালনা।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা-২ঃ

ধারা-১ এ বর্নিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই সংগঠন এবং এর সদস্যবৃন্দ নিম্নলিখিত মূলনীতিসমূহ অনুযায়ী কাজ করবে ঃ

১. সকল সদস্যের সার্বভৌমত্ব ও সমতার মূলনীতিব উপর এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত ।

২. সদস্যপদের অধিকারসমূহ ও সুবিধাদি সকলের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সদস্যগণ বর্তমান সনদ অনুযায়ী তাদের দায় দায়িত্ব সরল বিশ্বাসে মেনে চলবে ।

৩. সকল সদস্য তাদের আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে নিস্পত্তি করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার বিঘ্নিত না হয় ।

৪. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল সদস্য আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোন উপায় গ্রহন করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে ।

৫. সকল সদস্য বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং যে সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রতিষেধক বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেই সব রাষ্ট্রকে সাহায্য দান থেকে বিরত থাকবে ।

৬. জাতিসংঘ বহির্ভূত রাষ্ট্রসমূহ ও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে এসব মূলনীতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করে সেজন্য সংগঠনটি সচেষ্ট থাকবে ।

৭. বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোন রাষ্ট্রের নিছক অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিস্পত্তির জন্য কোন সদস্যকে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না ।[১৩]

৩.৩ জাতিসংঘ শান্তি মিশনের উৎপত্তিগত প্রেক্ষিত, লক্ষ্য ও কার্যক্রমঃ

আজ থেকে ৬২ বছর পূর্বে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমাদের উত্তরাধিকারীদেরকে যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ দেবার মহান ব্রত নিয়ে । সেটা কতটুকু কার্যকর হয়েছে, ওটাই এখন ভেবে দেখার বিষয় । তবে এ প্রসঙ্গে প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন যা বলে গেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রনিধানযোগ্যঃ "যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিই শান্তি রক্ষার সব চাইতে কার্যকর উপায় ।"[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ তার সকল কর্মতৎপরতা দিয়ে শান্তির প্রসার ঘটায়। কূটনীতি এবং বিতর্কের কেন্দ্র হিসেবে জাতিসংঘ যুদ্ধের বিকল্প পথ বাতলিয়ে দেয় এবং শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কাঠামো তুলে ধরে। যে কোন আন্তর্জাতিক সংকটকালে জাতিসংঘ উত্তেজনা প্রশমনে এবং আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে। সশস্ত্র সংঘর্ষের অবসান যারা চায় জাতিসংঘ তাদের আকর্ষনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিগণিত হয়। শান্তিরক্ষা প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক আইন কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে মানবাধিকার সংরক্ষনের দ্বারা জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তির প্রসারে অবদান রাখছে। সংঘর্ষ বাঁধার আগেই নিবারক কূটনৈতিক তৎপরতার সাহায্যে জাতিসংঘ তা নিরসনের জন্য সচেষ্ট হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এবং গণতন্ত্রায়নে জাতিসংঘ সহযোগিতা করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারা এগিয়ে নেবার মাধ্যমে জাতিসংঘ যুদ্ধ বিগ্রহের নেপথ্য কারণ বা উৎসসমূহ নির্মূল করে অর্থাৎ শান্তিকে স্থায়ী করতে সহায়তা করে। জাতিসংঘের ব্যবস্থাধীন অন্যান্য সংস্থার তৎপরতার পাশাপাশি এই বিশ্ব সংস্থা মানবিক সাহায্য, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন, জাতীয় অবকাঠামো মেরামত এবং পূর্ণ গঠনে সহযোগিতা করে থাকে।[১৫]

জাতিসংঘের কার্যকারিতা নির্ভর করে এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর যারা সিদ্ধান্ত নেয় বিরোধ মীমাংসায় জাতিসংঘ কখন, কিভাবে কি ভূমিকা রাখবে।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রয়েছে এক বিশেষ দায়িত্ব। কোন বিরোধের সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের প্রতি নিরাপত্তা পরিষদ কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে থাকে। বিরোধ মীমাংসার একটা উপায় বের করে দেয় (যেমন তথ্য অনুসন্ধানী কিংবা মধ্যস্থতাকারী মিশন)। মহাসচিবের কূটনৈতিক তৎপরতাক্রমে আলোচনার দ্বার উন্মোচিত হতে পারে এবং যুদ্ধ সংঘাত প্রশমিত হতে পারে। যুদ্ধ বিরতি বা সন্ধি স্থাপিত হবার পর নিরাপত্তা পরিষদ বিবাদরত পক্ষসমূহের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদের অনুরোধে কোন পক্ষ সাড়া না দিলে পরিষদ তখন অর্থনৈতিক অবরোধ অথবা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার মত কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের বিচারের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক আদালত গঠন করতে পারে। যেমন করা হয়েছে রুয়ান্ডা এবং সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ সশস্ত্র সংঘাত থামাতে কোন সদস্য রাষ্ট্রকে সৈন্য মোতায়েন করা সহ 'প্রয়োজনীয় সকল শক্তি' প্রয়োগ করার অধিকার প্রয়োগ করেছে। যেমনটি করা হয়েছে ১৯৯১ সালে কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারে কিংবা ১৯৯৪ সালে হাইতির বৈধ সরকারকে

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্বহালের ক্ষেত্রে। সদস্য রাষ্ট্রবর্গের অংশ গ্রহনের ফলে এ ধরনের বল প্রয়োগের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।[১৬]

জাতিসংঘের কোন স্থায়ী আন্তর্জাতিক পুলিশ বা সেনাবাহিনী নেই। সনদ অনুযায়ী সদস্য দেশগুলো স্বেচ্ছাপ্রনোদিত হয়ে পুলিশ ও সৈন্য বাহিনী সরবরাহ করে থাকে। শান্তিরক্ষীগণের যে ভারী যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাও সরবরাহ করে সদস্য দেশগুলো। বেসামরিক নাগরিক, সাধারণত যারা জাতিসংঘের কর্মকর্তা কর্মচারী তারাও এধরনের কার্যক্রমগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।[১৭]

৩.৪ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম কি

শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর মধ্যেকার বিরোধ নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান করতে জাতিসংঘের অধীনে বহুজাতিক বাহিনীর ব্যবহারকে প্রচলিত অর্থে শান্তিরক্ষা বলা হয়ে থাকে। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ যুদ্ধ বিরতির সূচনা ও তা বজায় রাখতে এবং যুদ্ধরত পক্ষগুলোর মধ্যে একটি বিরোধ নিবারক অঞ্চল বা বাফার জোন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি কূটনৈতিক পর্যায়ে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপায় অনুসন্ধানের পথ সহজতর করে। শান্তিরক্ষীগণ এলাকায় শান্তিরক্ষা নিশ্চিত করে। আর জাতিসংঘের মধ্যস্থতাকারীগণ বিবদমান পক্ষ বা দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করে।[১৮]

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সংগা দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঁধা রয়েছে। কারণ ইহার ধারনা বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের। নিউইয়র্ক ভিত্তিক আন্তর্জাতিক শান্তি একাডেমী সর্বসম্মতভাবে গৃহীত নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি প্রদান করেছেনঃ

বিবদমান দেশগুলোর মধ্যে বিরুদ্ধাচারনের সমাপ্তিকরণ, নিবারণ, অন্তর্ভূক্তিকরণ, সংযম প্রদর্শন করা হয় শান্তিপূর্ণ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার মাধ্যমে এবং এটা নির্দেশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক ভাবে শান্তি স্থাপনের জন্যে বহুজাতিক বাহিনী তথা সামরিক,বেসামরিক এবং পুলিশ বাহিনী ব্যবহার বা মোতায়েন করা প্রসঙ্গে।[১৯]

Dhaka University Institutional Repository

প্রাক্তন জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি প্রদত্ত সংজ্ঞার উপর আমরা নির্ভর করতে পারি: শান্তিরক্ষা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সকল বিবাদমান দলগুলোর সর্বসম্মতিক্রমে মোতায়েনকৃত জাতিসত্তার শ্রেণীবদ্ধকরণ। স্বাভাবিকভাবে সেখানে সামরিক,বেসামরিক, পুলিশ ও সকল সরকারী কর্মচারীবৃন্দকে মোতায়েন করা হয়। শান্তিরক্ষা হচ্ছে একটা কৌশল যা সংঘাত দূরীকরণে এবং শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনাকে বিস্তৃত করে।[২০]

প্রচলিত শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে গঠিতঃ

(ক)যুদ্ধরত জাতি বা রাষ্ট্রসমূহের সম্মতিক্রমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে।

(খ)শান্তিরক্ষীগণ কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে।

(গ) শান্তিরক্ষীগণ কেবলমাত্র নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে।

শান্তিরক্ষীদের প্রধান কাজ হলো যুদ্ধ বিরতি এবং অস্ত্র বিরতি তদারক করা। সৈন্য অপসারণে সহায়তা করা এবং সংঘাতরত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে 'বাফার জোন' প্রতিষ্ঠা করা। তারা কেবল মাত্র হালকা অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। সেই ধারনায় ইহাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় নয়। তারা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আস্থা ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করবে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না এই সফলতার পেছনে অনেক বাঁধা আছে।[২১]

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ প্রথম বারের মত আরব ইসরাইল সাময়িক যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) গঠন করে।[২২] ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর সংক্রান্ত ভারত পাকিস্তান বিরোধের পর ১৯৪৯ সালে United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNIMOGIP) গঠন করে। এ দুটাই ছিল পর্যবেক্ষক মিশন এবং এগুলোর কার্যক্রম এখনোও চলছে।[২৩]

১৯৫৬ সালে সুয়েজ বিরোধের সময় কানাডার তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সপ্তম প্রেসিডেন্ট লেস্টার পিয়ারসন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষাকে মূল্যায়ন করেন। দ্যাগ হ্যামারশোল্ড এই গতানুগতিক ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বেশীর ভাগ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম তার তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এই তথ্যের উপর মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের অবশিষ্ট দায় দায়িত্বের ফলে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সদস্য রাষ্ট্রগুলো শান্তিরক্ষী সৈন্য সরবরাহ এবং

Dhaka University Institutional Repository

এই কার্যক্রমের অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।[২৪] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তার ভিত্তি গড়ন করেছে। বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের পর দুই পরাশক্তির মাঝখানে পারমানবিক ও আঞ্চলিক যুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তির প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে।[২৫]

জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালে UNTSO এবং ১৯৪৯ সালে UNIMOGIP গঠন করে। ১৯৫৬ সালে UNEF বা জাতিসংঘ জরুরী ফোর্স গঠন করে। প্রথম দুটা পর্যবেক্ষক মিশন এবং তৃতীয়টা বা UNEF ছিল প্রকৃত পক্ষে শান্তি মিশন। তবে শান্তির উদ্দেশ্যেই এগুলো গঠন করা হয়েছে। কি অবস্থায় ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ UNTSO গঠন করেছিল ইসরাইল প্যালেষ্টাইন সংঘাতকে কেন্দ্র করে, সেই সংঘাতের একটা সংক্ষিপ্ত সূচনা পর্ব তুলে ধরা হলোঃ

আজকে যে ভূমি ইসরাইলীরা দখল করে আছে, সেখানে প্যালেষ্টাইনীদের পূর্ব পুরুষরা বাস করতো। প্রকৃত পক্ষে এই এলাকার আদি অধিবাসী ছিল এ্যামোরীয়া, ক্যানানীয়, আরামীয় এবং আরব সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী। খ্রীষ্ট পূর্ব ২ হাজার বছর পূর্বে ক্যানানীয় সম্প্রদায় সেখানে ক্যানান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে হযরত মুসা (আঃ) এর শিষ্য হিব্রু সম্প্রদায়ের লোকেরা মিশর থেকে ফারাও কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে প্যালেষ্টানের কোন কোন এলাকায় বসবাস শুরু করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলে হিব্রুদের পতন ঘটে এবং ইসরাইলীরা দেশ ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে প্যালেষ্টাইনী আরবরা তাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমিতে রয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত প্যালেষ্টাইন অটোমান সাম্রাজ্যের দখলে আসে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশরা তুর্কীদের পরাজিত করে প্যালেষ্টাইন দখল করে নেয়। এ ঘটনার কয়েকদিন আগে তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যালফুর ঘোষণা দেন যে যুদ্ধ শেষে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের আবাস ভূমি হিসেবে সৃষ্টি করা হবে। উল্লেখ্য এই সময়ে সেখানে আরব অধিবাসীরা ইহুদীদের সংখ্যায় ১০ গুণেরও বেশী ছিল। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশরা ইহুদীদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে ১৯৩০-১৯৩৭ সালে নতুন পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে এনে জড়ো করা হয়। যুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালের ১৫ই মে নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী প্রতিনিধি মিলিত ভাবে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। উল্লেখ্য যে রাষ্ট্র হিসেবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেবার আগে প্যালেস্টাইনের মাত্র ৫.৬৫ ভাগ ভূমি তাদের অধিকারে ছিল। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে এর ১০ গুণ এলাকা দেয়া হয়। প্যালেষ্টাইনসহ আরব বিশ্বের কেউই জাতিসংঘের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি। ইসরাইলীরা বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত প্যালেষ্টাইনের ৭৮ ভাগ এলাকা দখল করে নেয়। ১৯৬৭ সালের ৬ দিন ব্যাপী যুদ্ধে ইসরাইল সম্পূর্ণভাবে আরবদের পরাজিত করে এবং প্যালেষ্টাইনের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। তখন থেকে প্যালেষ্টাইনীরা নিজ বাস ভূমে পরবাসী হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।[২৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুযায়ী প্যালেস্টাইন বৃটিশ শাসনাধীন অঞ্চলে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিয়ে একটি আরব ও একটি ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করার পরিকল্পনা তৈরী করে। যদিও জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র হয়েছে। আরব রাষ্ট্র হয়নি। এই নতুন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরবরা সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যায়। নিরাপত্তা পরিষদ উভয়ের বিভক্তি তদারক করার জন্য UNTSO গঠন করে।[২৭]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু কাশ্মীরের বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়। কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ছিল উদগ্রীব। অপর দিকে কাশ্মীরের দেশীয় হিন্দু রাজা ভারতের সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালান। শুরু হয় উভয় দেশের লড়াই। ভারত কাশ্মীরের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চল দখল করে নেয় এবং পাকিস্তান এক তৃতীয়াংশ। সেই বিভাজন রেখা তদারক করার জন্য ১৯৪৯ সালে নিরাপত্তা পরিষদ UNMOG গঠন করে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৫৬ সালে প্রথম শান্তি মিশন বা Peace keeping force গঠন করা হয় সিনাই এ সুয়েজ বিরোধকে কেন্দ্র করে। এটা ছিল শান্তি রক্ষা কার্যক্রমের নতুন পর্যায়।[২৮]

দুই ধরনের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম রয়েছে :

একটি হলো পর্যবেক্ষক দল এবং অন্যটি হলো শান্তিরক্ষী বাহিনী। পর্যবেক্ষকগণ সশস্ত্র থাকেন না। শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা হালকা অস্ত্র বহন করেন, এগুলো তারা কেবল আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

সাবেক জাতিসংঘ উপমহাসচিব ব্রয়ান উরকুহার্ট এর মতে, শান্তিরক্ষা হচ্ছে হাসপাতালের স্টাফ যাদের কাজ হলো রোগীর দেহের তাপমাত্রা নামিয়ে রাখা এবং তাকে মোটামুটি সুস্থ রাখা। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে হয়ত একজন বড় সার্জন এসে সমস্যাটা নিজের হাতে তুলে নেবেন।[২৯] জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম সত্যিকার অর্থে একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। বহুদেশ থেকে প্রেরিত হয় এই শান্তিরক্ষী কর্মী বাহিনী। যার মধ্যে থাকে সৈনিক, বেসামরিক পুলিশ, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, মাইন পরিস্কারক, মানবাধিকার পর্যবেক্ষক, বেসামরিক প্রশাসন ও যোগাযোগ বিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে। নিরাপত্তা পরিষদ সুপারিশের ভিত্তিতে কোন শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ম্যান্ডেট, আকার, সুযোগ ও স্থায়িত্বকাল নিরুপন করে থাকে। সেই সাথে নিরুপিত হয় মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অর্থনৈতিক প্রতিবেদন। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদের ৫ স্থায়ী সদস্যসহ ৯ ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫ স্থায়ী সদস্যের ভেটো ক্ষমতা রয়েছে। যে কোন সিদ্ধান্তে এর ৫ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের যে কোন একটি পক্ষ ভেটো দিতে পারে।[৩০]

৩.৫ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম স্থাপন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম মূলত নিরাপত্তা পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। অন্যভাবে বলা যায়, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্ব নিরাপত্তা পরিষদের। জাতিসংঘের কোন একটি সদস্য রাষ্ট্র বা কয়েকটি রাষ্ট্র মিলে একত্রে অথবা মহাসচিব কোন সংঘর্ষরত অঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম স্থাপনের প্রস্তাব করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে ৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়। এগুলো হলোঃ

১। ঐ সংঘর্ষ বা সংঘর্ষ অঞ্চলে যে সকল দেশের অবস্থান বা যে সকল দেশ এর সংগে জড়িত সাধারণভাবে তাদের সম্মতিক্রমে এ কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। এ ধরনের কার্যক্রমে ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমর্থন থাকতে হবে। বিশেষত নিরাপত্তা পরিষদের ভোটে এটি পাশ হবার মত অবস্থা থাকতে হবে।

৩। জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোকে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে সৈন্য দেয়া ও অর্থ-সাহায্যের জন্য তৈরী থাকতে হবে।[৩১]

শান্তিরক্ষী সৈন্য কর্তৃক শক্তি প্রয়োগের নজির খুবই বিরল। তাছাড়া এদের পক্ষে শক্তি-প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়াও যেমন কঠিন, তেমনি বিষয়টি বিতর্কিত। একজন শান্তিরক্ষী সৈনিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো তার প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং শান্তির প্রতি তার সুগভীর অঙ্গীকার। প্রতিটি পরিস্থিতিতেই যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম প্রযোজ্য হবে এমন কোন কথা নেই। উদাহরণ স্বরূপ বলা

Dhaka University Institutional Repository

যেতে পারে সোমালিয়ায় জাতিসংঘের তৎপরতা সত্ত্বেও বিবদমান পক্ষগুলো যুদ্ধ থামায়নি। আবার রুয়ান্ডার গনহত্যা কিংবা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধযজ্ঞ নিজের থেকে বন্ধ হয়নি। তবে দ্বন্দ্ব অবসানে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় শান্তিরক্ষা কার্যক্রম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে যদি পরিস্থিতি সেরকম উপযুক্ত হয়, ম্যান্ডেটটি হয়, বাস্তব সম্মত, পর্যাপ্ত সম্পদ থাকে এবং পক্ষগুলো জাতিসংঘের কার্যক্রমের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়ায়।[৩২]

জাতিসংঘ সনদের ষষ্ট অধ্যায়ের ধারা ৩৩ থেকে ধারা ৩৮ পর্যন্ত বিরোধাদির শান্তি পূর্ণ মীমাংসা এবং সপ্তম অধ্যায়ের ধারা ৩৯থেকে ধারা ৫১ পর্যন্ত শান্তির প্রতি হুমকী, শান্তিভঙ্গ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।[৩৩]

৩.৬ শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশ

জাতিসংঘ সনদের ১১ ধারা অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তি ও শান্তি জোরদারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিগত বছর গুলোতে গৃহীত প্রধান প্রধান প্রস্তাব ও ঘোষণাসমূহ নিম্নরূপঃ

১। ১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রসমূহের মাঝে শান্তিপূর্ণ ও সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্পর্ক বিষয়ক প্রস্তাব।

২। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং এদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ সংক্রান্ত ঘোষণা।

৩। ১৯৭০ সালের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা জোরদার সংক্রান্ত ঘোষণা।

৪। ১৯৭০ সালের জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষনা।

৫। ১৯৭৭ সালের আন্তর্জাতিক দাঁতাত নিবিড় ও সংহতকরণ সংক্রান্ত ঘোষনা।

৬। ১৯৭৮ সালের শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রার জন্য বিশ্ব সমাজের প্রস্তুতি সংক্রান্ত ঘোষনা।

৭। ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীন বিষয়ে অনুপ্রবেশ ও হস্তক্ষেপ না করা সংক্রান্ত ঘোষনা।

৮। ১৯৮২ সালের আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তি সংক্রান্ত ম্যানিলা ঘোষনা।

৯। ১৯৮৪ সালের শান্তির প্রতি জনগণের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষনা।

১০। ১৯৮৭ সালের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ বা বল প্রয়োগের হুমকী থেকে বিরত থাকার নীতিমালার কার্যকারিতা জোরদার সংক্রান্ত ঘোষনা।

Dhaka University Institutional Repository

১১। ১৯৮৮ সালের আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এমন বিরোধ ও পরিস্থিতি প্রতিরোধ ও অপসারণ এবং এক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা সংক্রান্ত ঘোষনা এবং

১২। ১৯৯১ সালের আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের তথ্য অনুসন্ধান সংক্রান্ত ঘোষনা।[৩৪]

১৯৮০ সালে সাধারণ পরিষদ কোস্টারিকার সান যোসে'তে শান্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে। শান্তির জন্য প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যে গবেষণা চালানো, অধ্যায়ন ও জ্ঞান দান করাই এই আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের কাজ। পরিষদ প্রতিবছর নিয়মিত অধিবেশনের উদ্বোধনী দিন অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারকে আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস হিসেবে ঘোষনা করেছে। পরিষদ ১৯৮৬ সালকে আন্তর্জাতিক শান্তি বর্ষ হিসেবে ঘোষনা করে।[৩৫]

৩.৭ শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি সংরক্ষণ

জাতিসংঘ তার সমগ্র ইতিহাসে প্রায়শই যুদ্ধে পরিণত হবার মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অস্ত্রের বদলে আলোচনা বৈঠকে বসার জন্য বিবদমান পক্ষগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় অথবা যুদ্ধ শুরু হলে যুদ্ধ বিরতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। সংঘর্ষ প্রতিরোধ বা বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন বিরোধে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী, পর্যবেক্ষক বা তথ্য অনুসন্ধানী মিশন, মধ্যস্থতা মিশন, মধ্যস্থতাকারী ও বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জাতিসংঘে বিতর্ক ও আলোচনা অনুষ্ঠান এবং নীরব কূটনীতির ব্যবস্থা করেছে।

পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মাঝে ঐক্যের চেতনার বিকাশ এবং জাতিসংঘ ও তার মুখ্য অঙ্গ সংগঠনগুলোকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ পক্ষসমূহের মাঝে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মহাসচিবের ভূমিকা ও তার কাজকে জোরদার করেছে। তাঁর মধ্যস্থতাকে পক্ষসমূহের মাঝে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশী করে কাজে লাগানো হচ্ছে। আফগানিস্তান, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, নামিবিয়া, মধ্য আমেরিকা ও কম্বোডিয়ার মতো ঘটনাবলী মহাসচিবের শান্তিরক্ষার ভূমিকার সাক্ষ্য দেয়।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

শীতল যুদ্ধের অবসানের পর জাতিসংঘের শান্তি মিশনের পরিমান বেড়ে গেছে। সাথে সাথে শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য ও বদলে গেছে। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ৪৩ বছরে মাত্র ১৩টি শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালিত হয়েছিল।[৩৭]

এই ১৩ টির মধ্যে একটি বাদে বাকী ১২টি মিশন ছিল গতানুগতিক বা প্রচলিত কার্যক্রম ধারার। তাদের গঠন ছিল বহুলাংশে সামরিক এবং দায়িত্ব ছিল যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ, বাফার জোন নিয়ন্ত্রণ এবং যুদ্ধ পুনরায়ম্ভ রোধ করা। তারা রনাঙ্গণে শান্তি বজায় রেখে শান্তি স্থাপনকারীদের সময় দিতো আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করার।[৩৮]

১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ সালে নিরাপত্তা পরিষদ ৫টি নতুন শান্তি মিশনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৮ সাল হতে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত ১৩টি মিশন গঠিত হয়।[৩৯] এই ১৩টির মধ্যে মাত্র ৫টির কার্যক্রম ছিল গতানুগতিক। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত গঠিত হয় ২২টি মিশন এবং ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৪৭টি মিশন। অর্থাৎ ৪৩ বছরে ১৩টি মিশন এবং মাত্র ১৮ বছরে ৪৭টি মিশন গঠিত হয়। এ থেকেই বুঝা যায় ঠান্ডা লড়াইয়ের পর এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের কার্যকারিতা কত ব্যাপক ও বিস্তৃত। বর্তমানে শান্তিরক্ষীগণ কেবল মাত্র প্রচলিত সামরিক দায়িত্ব নয় বেসামরিক দায়িত্ব ও পালন করে থাকে। যেমন, এল সালভাদরে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশনের (ONUSAL) কাজ কেবল যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণ নয়, সশস্ত্র বাহিনী পূর্নগঠন ও হ্রাস, একটি নতুন পুলিশ বাহিনী গঠন, বিচার ও নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার এবং মানবাধিকার, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়াদি দেখাও তাদের দায়িত্ব। কম্বোডিয়ায় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের ফলে জাতিসংঘ অন্তবর্তীকালীন কর্তৃপক্ষের (UNTAC) উপর প্রশাসনের নানা শাখা নিয়ন্ত্রণ ও তদারক, নির্বাচন অনুষ্ঠান, পুলিশ পর্যবেক্ষণ, মানবাধিকার উন্নয়ন, সাড়ে তিন লাখের বেশী শরনার্থী ও বাস্তচ্যুত ব্যক্তির প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের দায়িত্ব বর্তায়। নিকারাগুয়া ও হাইতির জাতীয় নির্বাচন তদারকের জন্য জাতিসংঘকে ডাকা হয়। নামিবিয়ায় জাতিসংঘ অন্তবর্তীকালীন সহায়তা গ্রুপ (UNTAG) শান্তিপূর্ণ ভাবে দেশটির স্বাধীনতা লাভ নিশ্চিত করে।[৪০]

১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীকে বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।[৪১] ২০০২ সাল থেকে প্রতি বছর ২৯ শে মে বিশ্ব ব্যাপী জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। মূলত শান্তির প্রতি বিশ্বব্যাপী অঙ্গীকার ও আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

স্নায়ুযুদ্ধের সময়ে শান্তিরক্ষী সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং যে কোন সময়ে সেই সংখ্যা ২০০০ এর অধিক ছিল না। কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সাথে সাথে এই সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৮৭ সালে তা ১০,০০০ এ এসে দাঁড়ায়। ১৯৯৪ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ১৯,০০০ এর বেশী সৈন্য কেবল সোমালিয়ায় এবং ৩৬,০০০ এর অধিক সৈন্য বোসনিয়া-হার্জেগোবিনায় মোতায়েন ছিল।[৪২]

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের গতি, প্রকৃতি ও পরিধি বাড়ার সাথে সাথে এর শান্তিরক্ষীর সংখ্যা এবং বাজেট ও বেড়ে যায়। জানুয়ারী ১৯৮৮ সালে মিলিটারী, পুলিশ এবং বেসামরিক লোক মিলিয়ে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১১,১২১ জন এবং শান্তি রক্ষা খাতে বাজেট ছিল ২৩০.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ডিসেম্বর ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৭৭,৭৮৩ জনে এবং এর সর্বোচ্চ বাজেট এসে দাঁড়ায় ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে।[৪৩]

৩.৮ শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচী

১৯৯২ সালের ৩১ জানুয়ারী নিরাপত্তা পরিষদ প্রথমবারের মতো রাষ্ট্র প্রধান পর্যায়ে বৈঠকে মিলিত হয়। নজীর বিহীন এই বৈঠকে পরিষদ সদস্যরা সনদের লক্ষ্য ও নীতিমালার প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুর্নব্যক্ত করেন এবং শীর্ষ বৈঠক শেষে একটি ঘোষনা গৃহীত হয়। এতে সদস্যরা জাতিসংঘের নিবারক কূটনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষার সামর্থ বৃদ্ধির উপায় সুপারিশ করার জন্য মহাসচিবের প্রতি আহবান জানান।

১৯৯২ সালের জুন মাসে মহাসচিব 'শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচী'(An Agenda for Peace) নামের একটি রিপোর্ট সদস্য রাষ্ট্র সমূহের কাছে পেশ করেন। এতে সম্ভাব্য সংঘাত চিহ্নিত করা,সেগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান খুঁজে বের করা এবং সংঘাত অবসানের পর সাবেক শত্রুদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের তৎপরতা আরো জোরদার করার সমন্বিত কর্মসূচীর প্রস্তাবাবলী তুলে ধরা হয়।

নিবারক কূটনীতির ক্ষেত্রে মহাসচিব আস্থাবৃদ্ধি ও তথ্য অনুসন্ধান তৎপরতা জোরদার করার এবং শান্তির প্রতি সম্ভাব্য হুমকী নিরুপনের লক্ষ্যে আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুপারিশ করেন। যার মাধ্যমে সশস্ত্র সংঘর্ষ সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সংঘর্ষ প্রতিরোধের জন্য ঘটনাস্থলে জাতিসংঘ বাহিনী পাঠানো যাবে। তিনি প্রস্তাব করেন নিবারক বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অসামরিক অঞ্চল

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি আরো সুপারিশ করেন জনসংখ্যার ব্যাপক স্থানান্তর, দুর্ভিক্ষ ও জাতিগত অসন্তোষের মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকী সৃষ্টি করতে পারে সে সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ তথ্য সংগ্রহ করবে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের আরো সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কোন বিরোধের মধ্যস্থতা আলাপ-আলোচনা ও সালিসের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের পূর্ণ অংশগ্রহণের আহবান জানান। তিনি মত পার্থক্য শান্তিপূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে আর্ন্তজাতিক আদালতের উপর আরো আস্থাশীল হবার জন্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহবান জানান। তিনি সংঘাত সৃষ্টির পরিবেশ দূর করতে জাতিসংঘকে সক্ষম করে তোলার জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানান।

শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সনদের সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে নিরাপত্তা পরিষদ যাতে শান্তির প্রতি হুমকী বা আগ্রাসনের মুখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠায় সামরিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করেন। তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জিম্মাদার হিসেবে জাতিসংঘের প্রতি আস্থার জন্য এই বিকল্প ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম প্রশ্নে, নতুন কার্যক্রমের প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘকে কি ধরনের ও কত সংখ্যক লোক দিতে পারবে সে সম্পর্কে তথ্য প্রদানের আহবান জানান।

শান্তির লক্ষ্যে কর্মসূচীতে মহাসচিব একটি ক্ষুদ্র, বহুজাতিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবিত বাহিনীকে নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্বাধীনে সক্রিয় করা যাবে এবং সংকটকালে দ্রুত মোতায়েন করা সম্ভব হবে। যুদ্ধবিরতি পালনের দায়িত্ব যেখানে শান্তিরক্ষা মিশনকে দিয়ে কুলোবে না সেখানে এই বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শান্তি বলবৎকরণ ইউনিট মোতায়েন করা যাবে।

মহাসচিব যুদ্ধোত্তর সময়ের জন্য ব্যাপক শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের সুপারিশ করেন। এর মধ্যে রয়েছে শরনার্থী প্রত্যাবাসনের জন্য পক্ষ সমূহের যৌথ প্রয়াস, স্থল মাইন অপসারণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পানি ও বিদ্যুতের মত সম্পদের ব্যবহার। তিনি নির্বাচন তদারক, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পূর্ণ নির্মাণ বা জোরদার এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ প্রচেষ্টার অগ্রগতিতে জাতিসংঘের সহায়তার উপর জোর দেন।

Dhaka University Institutional Repository

মহাসচিব নিবারক কূটনীতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষায় আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালনের সঙ্গে জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনকে সম্পর্কযুক্ত করার প্রস্তাব করেন।

সবশেষে তিনি প্রতি দু বছরে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের বৈঠকে মিলিত হবার প্রস্তাব করেন। এই বৈঠকে শান্তির পথে জাতিসংঘ কিভাবে সর্বোত্তম উপায়ে কাজ করতে পারে সে সম্পর্কে তারা নতুন ধ্যান-ধারনা দেবেন।[৪৪]

১৯৯৫ সালের জানুয়ারীতে শান্তির লক্ষ্যে কার্যসূচীর একটি সম্পুরক প্রকাশিত হয়। মহাসচিব এতে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান সংঘাত সমূহের বেশীর ভাগ রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরে ঘটছে, সেনাবাহিনী ও অনিয়মিত সেনারা এসব যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। এতে প্রধানত বেসামরিক জনগণই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ নতুন জাতের সংঘাতগুলো প্রায়ই জরুরী মানবিক ত্রাণ কাজে জড়িয়ে পড়ে, যা সমাধান করা যোগ্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরে হতে পারে।

যে সব ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে সম্পূরকটি সেগুলো তুলে ধরেছে। এসবের মধ্যে রয়েছে অর্থায়ন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশের সুস্পষ্টতা এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সহায়তায় পরিচালিত কার্যক্রম।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়- তথ্যপঞ্জী

১। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, নভেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা-৯ এবং হোসেন তোফাজ্জল, "জাতিসংঘ", আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি-২০০৭, পৃ-৩৫ ।

২। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ পূর্বোক্ত ঃ পৃ-৭

৩। Basic Facts About the United Nations,
Deparment of Public Information,
United Nations, New York, 1992, P-3

৪। হোসেন তোফাজ্জল, জাতিসংঘ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৫। Basic Facts about the United Nations,
Ibid, p-3

৬। হোসেন তোফাজ্জল, জাতিসংঘ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮, ২৯

৭। Ali Zearat T.A,
biiss paper-16, July-1998,
Bangladesh Institute of International and Strategic Studies, Dhaka, Bangladesh, page-2

৮। Basic Facts About the United Nations
Ibid, p-4

৯। Ali Zearat T.A, Ibid p-2

১০। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ ধারণা ও বাস্তবতা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, অক্টোবর ২০০১, পৃঃ ১

১১। Basic Facts About the United Nations,
Ibid, p-7

১২। মোমেন নূরুল ডঃ (অনুবাদক)ঃ জাতিসংঘ সনদ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০১, পৃঃ ৫,৬

১৩। Ibid, p-3,4

১৪। রহমান আতাউর ঃ সংকিঞ্চিত, প্রবন্ধ ঃ যুদ্ধের যন্ত্রণা, জোনাকী প্রকাশনী, প্রকাশকাল ১৯৯৯, পৃ-৭৪ ।

১৫। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ ধারণা ও বাস্তবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৭

১৬। পূর্বোক্ত পৃঃ-৩০

১৭। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ
জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২,৩৩

১৯। Momen Nurul (Ed.) :
Peoples United Nations,
Twenty five Years of Bangladesh in the United Nations,
Published by: United Nations Information Center,
Dhaka, September 1999, p-69

২০। Ibid, p-69

২১। Ali Zearat T.A. Ibid, p-9,10

২২। The Blue Helmets: A Review of United Nations Peacekeeping, Third edition, 31 March-1996, Published by the United Nations Department of Public Information, New York, Chapter-2, p-17

২৩। Hossain Akmal (Ed.) :
Journal of International Relations,
Vol, I, No-2, January-June-1994,
Published by:The department of International Relations University of Dhaka,
p-52

২৪। Ali Zearat T.A Ibid, p-9

২৫। Basic Facts About the United Nations, Ibid, p-27

২৬। মিয়া মনিরুজ্জামান মোহাম্মদ; সমসাময়িক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
প্রকাশ কাল বই মেলা-২০০০, পৃঃ ১১৬, ১১৭

২৭। Basic Facts About the United Nations,
Ibid, p-62

২৮। The Blue Helmets, Ibid, p-43

২৯। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত), জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও, পূর্বোক্ত পৃঃ-৩৩।

৩০। Basic Facts, About the United Nations
Ibid, p-11

৩১। শাহেদ মোহাম্মদ সৈয়দ (সম্পাদিত) ঃ
জাতিসংঘের পঞ্চাশতম বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, ৫৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ডিসেম্বর-১৯৯৫, পৃঃ ৩১ এবং হোসেন তোফাজ্জল, জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফেব্রুয়ারি-২০০৭, পৃ. ৬৯।

৩২। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ধারণা ও বাস্তবতা, পূর্বোক্ত, পৃঃ-৩১

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। মোমেন, নূরুল ডঃ (অনুবাদক) : জাতিসংঘ সনদ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা ২০০১, পৃঃ ১৭-২৩

৩৪। Basic Facts, About the United Nations
Ibid, p- 28

৩৫। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ আজকের জাতিসংঘ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা আগষ্ট ১৯৯৫, পৃঃ-২৮

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ-২৯

৩৭। The Blue Helmets : A Review of United Nations Peace Keeping UNDPI, NY, Second edition, August-1990, P-XV.

৩৮। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত)ঃ আজকের জাতিসংঘ পূর্বোক্ত পৃঃ ৩০

৩৯। Basic Facts, About the United Nations, Ibid, P-29, 30.

৪০। Ibid, p-30, 31

৪১। Ibid, p-31

৪২। Boutros, Boutros-Ghali : (A), Building Peace and Development, Annual Report on the Work of the Organization, New York, Department of Public Information (DPI), UN, 1994,p-155

৪৩। The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace Keeping, third edition, 31, March-1996, Published by the United Nations, Department of Public Information, New York, NY-
10017, Chapter-2, p-4

৪৪। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ আজকের জাতিসংঘ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১-৩৩।

৪৫। অল্প কথায় জাতিসংঘ সনদ
জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ
ডিসেম্বর-১৯৯৭, পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০ জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

৪.১ জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ ঃ

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্ম হয়। ১৯০ বছরের বৃটিশ উপনিবেশিক দাসত্বের জিঞ্জির ছিন্ন করে ১৯৪৭ সালে এ জাতি প্রথম বারের মতো স্বাধীনতার স্বাধ পাওয়ার আকাংখা করেছিল। কিন্তু আমাদের সে আশা পূরণ হয়নি। সে স্বাধীনতা আমাদের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠেনি। এ জাতির দূর্ভাগ্যের ইতিহাস আরো দীর্ঘতর হয়েছে। এক উপনিবেশিক অন্ধকার থেকে আমরা আরেক উপনিবেশিক শোষনের গহবরে পদার্পন করেছি। গণতন্ত্রহীন স্বৈরশাসকদের পদতলে পিষ্ট হয়েছি। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম থেমে থাকেনি। ধারাবাহিক সংগ্রামের পথ ধরেই এসেছে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষের রক্তের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা, এই সার্বভৌমত্ব, এই রক্তরঞ্জিত লাল সবুজ পতাকা।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ভূমিকা ছিল খুবই হতাশাজনক। লক্ষ লক্ষ নিরীহ সাধারণ মানুষের মৃত্যু এবং প্রায় কোটি মানুষের দেশান্তর হওয়াকে তারা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার হীন চেষ্টা করেছে। তাদের নির্লিপ্ততার কারণে বাংলার মাটিতে নির্বিচার গণহত্যার ব্যাপারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কোন কার্যকর ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়। তথাপি স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়েই বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যখন এ দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়ছিল, লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ জীবনের ভয়ে বাড়ী ঘর ছেড়ে পালাচ্ছিল, দেশের সমস্ত অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন জাতিসংঘ নীরব এবং নিশ্চিন্তে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশের দিকে। অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং বাসস্থানের মত মানবিক বিষয়গুলোর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। প্রকৃত পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের জনগনের পাশেই ছিল।[১] জাতিসংঘ যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মানবিক বিপর্যয় এড়ানোর লক্ষ্যে ইতিহাসের বৃহত্তম মানবিক ত্রাণকার্য পরিচালনা করেছে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে।[২]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আবেদন করলে চীন নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়।[৩] এক্ষেত্রে চীনের যুক্তি ছিল উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে না আসায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ পেতে পারে না। ১৯৭৩ সালেও চীন দ্বিতীয় বার ভেটো প্রদান করে। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে পাকিস্তানী যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪] ফলে পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়। ১৯৭৪ সালের মে-জুন মাসে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে পুনঃ বিবেচনা পূর্বক সুপারিশ পেশ করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, ইসলামী সম্মেলন সংস্থাসহ জাতিসংঘের কয়েকটি অঙ্গ সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। অধিকাংশ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো প্রথম থেকেই বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করে আসছিল।[৫]

অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ওই সময় পৃথিবীর ১২৬টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[৬]

বাংলাদেশ জাতিসংঘে যোগদানের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে যথাযথ স্থান পায়। জাতির কষ্টার্জিত রক্তরঞ্জিত স্বাধীনতা আরো অর্থবহ হয়ে উঠে। তাই ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরনীয় দিন। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।[৭]

সদস্যপদ প্রাপ্তির পর পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এ জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বপ্রথম বাংলায় বক্তৃতা করেন। তার এই ঐতিহাসিক বক্তব্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্র বিশ্ব সংস্থায় উপস্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই সঙ্গে জাতিসংঘ সনদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে এ বিষয়টির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[৮]

সংবিধানে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন সংক্রান্ত ২৫-১ ও ২৫-২ ধারাটি নিম্নরূপ ঃ

২৫। ১ (১) জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রঃ

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করবে;

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

১ [২] রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে।[৯]

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান কেমন হবে তারই একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হলো সংবিধানের ২৫ আর্টিকেলটি, যা জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের পূর্বেই বাংলাদেশ গ্রহন করে নিয়েছে। সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়, এটা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলে ও সকল প্রকার সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ এবং উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রথম থেকেই সোচ্চার।

একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের নেতা হয়েও শেখ মুজিব তার বক্তৃতায় তৃতীয় বিশ্ব তথা মানব জাতির আশা-আকাঙ্খা তুলে ধরেন। তার তেজোদীপ্ত ভাষন শুধু কূটনৈতিক মহলকেই আলোড়িত করেনি নিপিড়ীত, বঞ্চিত এবং শোষিত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক মহলকেও আলোড়িত করেছিল। তিনি তার বক্তৃতায় ১৯৭১ সালের ৯ মাসের দীর্ঘ যুদ্ধ, সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয়,

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের ব্যাপারে ২ বছরের কূটনৈতিক যুদ্ধ এবং সদস্যপদ লাভ তুলে ধরেন। এই বিজয় এবং বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব সুলভ স্বীকৃতি এনে দেয়।[১০] অচিরেই বাংলাদেশ বিশ্ব সংস্থায় গঠন মূলক কর্মকুশলতার নজির স্থাপন করে এবং এর ফলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘ ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নির্বাচিত হয়। তবে ১৯৭৯-৮০ সালের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জাতিসংঘে যোগদানের মাত্র ৪ বছরের মধ্যে একটি স্বল্পোন্নত নবীন রাষ্ট্রের এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থায় স্থান লাভ ইতিহাসে এক অনন্য বিরল ঘটনা।[১১]

নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্ব সভায় বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এই সদস্যপদ অর্জন ছিল বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ ও অঙ্গ সংগঠন গুলোতে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশ গ্রহণের বহিঃ প্রকাশ।[১২]

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সত্বেও জাতিসংঘের প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার যে, এতটুকু হ্রাস পায়নি, তা এর রাষ্ট্র প্রধানদের ভূমিকা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ যথাক্রমে সাধারণ পরিষদের একাদশ বিশেষ অধিবেশন ও জাতিসংঘের চল্লিশতম বার্ষিকী উদযাপন অধিবেশনে ভাষন প্রদান করেন।[১৩] উল্লেখ্য যে,প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কেবলমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বিশ্ব সম্প্রদায়ের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব দেন। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ যে কোন দূর্যোগময় মূহুর্তে রাষ্ট্রনায়কোচিত ভূমিকা পালন করে।[১৪] ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এতে বাংলাদেশের ইমেজ বর্হিঃবিশ্বে আরো বৃদ্ধি পায়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতিসংঘের ৪৮ তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ পরিষদের ৫১তম অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

১৯৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশ ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময় জাতিসংঘের মহাসচিব পেরেজ ডি কুয়েলার বাংলাদেশের বন্যাদূর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জাতিসংঘ সংস্থা সমূহকে পরামর্শ দেন। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে পেরেস ডি কুয়েলার বাংলাদেশ সফর করেন এবং বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের ব্যাপারে জনগণকে আশ্বাস দেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশকে জাতিসংঘের একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জাতিসংঘ ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্কের সূত্র ধরেই ২০০১ সালের ১৩-১৫ মার্চ কফি আনান বাংলাদেশ সফরে আসেন। তার এই সফর জাতিসংঘে বাংলাদেশের গৌরবময় ভূমিকারই প্রতিফলন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য হিসেবে ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাংলাদেশ পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিল।[১৫]

৪.২ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের যোগদানের প্রেক্ষিতঃ

আয়তনে আমাদের দেশটি খুব বড় নয়। এর সম্পদ ও সীমিত। আয়তন আর সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই আমাদের আছে গৌরবময় ইতিহাস এবং ঐতিহ্য। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এ জাতির সবচেয়ে বড় ইতিহাস। সবচেয়ে বড় গৌরব গাঁথা বিজয়। সেই মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু। পৃথিবীর অন্যতম সুসজ্জিত, প্রশিক্ষিত এবং শক্তিশালী একটি বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র এবং ঘুমন্ত একটি জাতির উপর নগ্ন, বর্বর, ন্যাক্কারজনক, ঘৃন্য এবং ইতিহাসের এক পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ লড়াইয়ে নেমে পড়ে গোটা জাতি। শুরু হয় এক অসম লড়াই।

লড়াইটা অসমভাবে শুরু হলেও শীঘ্রই আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ এক সুসজ্জিত, বিশাল ও আধুনিক দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্ত ও অব্যর্থ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এটা সম্ভব হয়েছে এ জাতির সুদৃঢ় জাতীয়তাবাদ, অকৃত্রিম দেশ প্রেম, মাটি ও মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা এবং ঐতিহ্যগতভাবে শান্তি ও স্বাধীনতার প্রতি ইস্পাত কঠিন মনোবলের কারনে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ আমাদের দেশ প্রেমিক জনগণের পাশে থেকে যুদ্ধ করেছে, জনগণের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডঃ তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর "The Bangladesh Revolution and its Aftermath বই এর ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন "বাংলাদেশের অপারেশন-এ গেরিলাদের সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল বাংলাদেশের জনগণের প্রায় সম্পূর্ণ সমর্থন। মাও সেতুং এর ভাষায় জনগণ পানির মতো আর আর্মি মাছের মতো। জনগণকে সাথে নিয়ে পুরো দেশ মোবিলাইজ করা হলে একটা বিশাল গণমানুষের সমুদ্র সৃষ্টি হয় এবং এতে শত্রুকে নিমজ্জিত করা সম্ভব।" প্রকৃত পক্ষে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ঘটেছিল ও তাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের দিকে তাকালেই দেখা যায় আমাদের সেনা তথা দেশ রক্ষা বাহিনী দেশ প্রেমিক, স্বাধীনতা প্রিয়, শান্তিপ্রিয় এবং যোদ্ধা। ১৯৭১ সালে প্রায় নিরস্ত্র, ক্ষুদ্র যে বাহিনী এক বিশাল শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ে মাঠে নেমে আসে, অল্প সময়ের ব্যবধানে সেই ক্ষুদ্র বাহিনীই এক দুর্জয় অপ্রতিরোধ্য বাহিনীতে পরিনত হয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। অস্থায়ী সরকারের পদ যাত্রার সাথে সাথে সেই এপ্রিল মাসেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে কর্নেল (পরবর্তীকালে জেনারেল) আতাউল গনি ওসমানীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ক্ষুদ্র পরিসরে ক্ষুদ্রাকারে সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর ।[১৬] মুক্তি বাহিনীর গেরিলা তৎপরতা স্থলভাগ ছাড়িয়ে জল সীমায় ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর কর্মতৎপরতার কারনে। ১৯৭১ সালের নৌবাহিনীর "অপারেশন জ্যাক পট" নামক সেই নৌ কমান্ডো অপারেশনের সাফল্য মুক্তিযুদ্ধের অগ্রযাত্রাকে দিয়েছিল অসীম গতি। সে সময় নৌ কমান্ডোরা দখলদার বাহিনীর অনেক বাণিজ্যিক জাহাজ ডুবিয়ে দেয়ায় তারা তাদের সার্বিক যুদ্ধ কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়। ফলে বেগবান হয় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ত্বরান্বিত হয় আমাদের বিজয়।[১৭]

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের বিমান সেনারা বসে থাকেনি। ছোট আকারে হলেও লড়াইয়ের ময়দানে তারা ছিল জ্বল জ্বলে। যদি ও বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত এই দৃঢ় প্রত্যয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হতে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সেনা, নৌ, বিমান এবং সর্বস্তরে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সশস্ত্র বাহিনী বা মুক্তিবাহিনী। যার সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন জেনারেল এম এ জি ওসমানী। ১৯৭১ এর ২১শে নভেম্বর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিত ভাবে আক্রমন শুরু করে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে। ৩রা ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্র বাহিনী এসে যোগ দেয় মুক্তিবাহিনীর সাথে। সম্মিলিত আক্রমনের কাছে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয় পাক হানাদার বাহিনী।

যুদ্ধের ময়দান থেকে ক্ষুদ্রাকারে যে বাহিনীর উত্থান, সে বাহিনী আজ আর ক্ষুদ্র নয়। দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখন্ডতা রক্ষা এবং বহিঃ শত্রুর আক্রমন থেকে দেশকে মুক্ত রাখার পবিত্র ও সুমহান দায়িত্ব আজ সশস্ত্র বাহিনীর উপর। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনী আজ কার্যকর ও প্রশংসনীয় ভূমিকার দাবিদার।

Dhaka University Institutional Repository

জন্মলগ্ন থেকেই আমাদের সেনাবাহিনী দেশ ও জাতি গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বন্যা, টর্নেডো, সাইক্লোন, ঝড়, জলোচ্ছাসসহ যে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় আমাদের সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এগিয়ে আসে সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন ছাড়াও সেখানকার আর্থ-সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে আমাদের সেনা বাহিনী সুদূর প্রসারী ভূমিকা রেখে চলছে। সেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।[১৮]

স্নায়ু যুদ্ধকালীন এবং স্নায়ুযুদ্ধের পর পরিবর্তিত পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এখন যে কোন বহিঃ শত্রুর আক্রমনকে প্রতিহত করতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আজ বিশ্বের দরবারে একটি দক্ষ ও সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে সুপরিচিত।[১৯]

জন্মলগ্ন থেকেই জাতিসংঘ সনদের প্রতি বাংলাদেশ শ্রদ্ধাশীল। ঠান্ডা লড়াইয়ের দিনগুলোতে বাংলাদেশ কোন সামরিক জোটে না গিয়ে জোট নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করে সামনে অগ্রসর হয়েছে। আমাদের আত্মরক্ষা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য নিকট প্রতিবেশী ভারত এবং চীনের বন্ধুত্ব একান্ত কাম্য। যদিও ৭১-এ ভারত আমাদের সহযোগিতা ও চীন বিরোধীতা করেছিল। তথাপি পরবর্তী পরিবেশ, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। চীন এখন বাংলাদেশের পরীক্ষিত ভালো বন্ধু। কিছু অমীমাংসিত বিষয়ে বিরোধ থাকা সত্বেও ভারতের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক। এছাড়া ভারত এবং পাকিস্তানকে সাথে নিয়ে গঠিত হয়েছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম বা সার্ক। যে আঞ্চলিক সংস্থাটি গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে মুখ্য ভূমিকা। ভ্রাতৃ প্রতীম মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ট। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার ব্যাপারে বাংলাদেশের আপোষহীন মনোভাবের কারনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্নবাদী শাসনের অবসানের পর একমাত্র জায়নবাদী ইসরাইল ছাড়া পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ট ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং সে সম্পর্ক এখনো অটুট রয়েছে এবং দিনে দিনে জোরদার হচ্ছে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। সঙ্গত কারনেই জাতিসংঘ'সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে আমাদের আচরণ উদার এবং সহযোগিতামূলক। তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মনির্ভরশীল হওয়ার এক সুবর্ন সুযোগ জাতিসংঘের হাত ধরেই আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে।

ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের সাথে সাথে বিশ্ব হয়ে পড়ে এক মেরু কেন্দ্রীক। বিশ্বব্যাপী সংঘাত সংঘর্ষের মাত্রা বেড়ে যায়। সাথে সাথে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পরিধি ও বিস্তৃত হতে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের ডাক আসে বাংলাদেশের প্রতি। বাংলাদেশ কাল বিলম্ব না করে সে ডাকের প্রতি সাড়া দেয়। ১৯৮৮ সালে UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group) মিশনের অধীনে ইরাকে সশস্ত্র বাহিনীর ৩১ জন অফিসার প্রেরনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে নিজের নাম অন্তর্ভূক্ত করে।[২০] তারপর আর বাংলাদেশ থেমে থাকেনি। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি মহাদেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ করে বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতিসংঘের এ যাবৎ ৬১টি শান্তিরক্ষা মিশনের ৩১টিতেই বাংলাদেশ সৈন্য প্রেরণ করেছে বিশ্বের ২৫টি দেশে। বর্তমানে বাংলাদেশের আনুমানিক ১০ হাজারের অধিক শান্তিরক্ষী কঙ্গো, সুদান, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, আইভরিকোষ্টসহ ৮টি দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।[২১] যা জাতিসংঘের অধীনে নিয়োজিত শান্তিরক্ষী বাহিনীর ১৪ শতাংশ।[২২] এ ছাড়া কুয়েত পূর্নগঠন কার্যক্রমেও বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের এই ব্যাপক অংশ গ্রহন বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের পরিচিতি ও ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। রোগ, জরা, ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ তার চিরাচরিত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে এখন বিশ্বের অনেক সংঘাতময় দেশে আস্থা, ভরসা ও বিশ্বাসের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়- তথ্যপঞ্জী

১। Momen Nurul (Ed.): Peoples United Nations (Twenty-five Years of Bangladesh in the united Nations), United Nations Information Center, Dhaka, Bangladesh, Published in September-1999, p-46

২। Basic facts about the United Nations:
Department of Public Information, United Nations,
New York, 1992, p-75

৩। Momen Nurul (Ed.): Peoples United Nations
Ibid, p-63

৪। Ibid, p-3

৫। Ibid, p-63

৬। কামাল, মোস্তফা ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ৪৬/১,হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর , ঢাকা-১১০০, পক্ষে এফ রহমান কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০২ ইং; পৃঃ ১৪১ ।

৭। Momen Nurul (Ed.): Peoples United Nations,
Ibid, p-1

৮। কামাল, মোস্তফা পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১

৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ
ডেপুটি কন্ট্রোলার, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত । ১৯৯১, পৃঃ ১৪-১৬ ।

১০। Momen Nurul (Ed.): Peoples United Nations,
Ibid, p-61

১১। জাতিসংঘে বাংলাদেশের পঁচিশ বছর, "জাতিসংঘ তথ্যকেন্দ্র", ঢাকা, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ১

১২। কামাল, মোস্তফা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১

১৩। জাতিসংঘে বাংলাদেশের পঁচিশ বছর, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১

১৪। Momen Nurul (Ed.): Peoples United Nations,
Ibid, p-10

১৫। কামাল, মোস্তফা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪১ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। বি,টি,ভি সংবাদ, রাত ৮টা,

২১শে নভেম্বর ২০০৬ ইং।

১৭। কমান্ডার হোসেন , এস,কে, (ট্যাজ), এন সি সি, পি এস সি, বি এন, বাংলাদেশের জন্য ন্যাভাল স্পেশাল ফোর্সের উপযোগিতা, বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস, ২০০৬, দৈনিক আমার দেশ, ২১ শে নভেম্বর, ২০০৬ ইং। পৃঃ ১২।

১৮। কমডোর রহমান, এম, (ট্যাজ), (সিডি), এন, ডি ইউ, পি এস সি, বি এন, দেশ মাতৃকার উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯।

১৯। স্কোয়াড্রন লীডার হান্নান আবদুল আ ন ম

প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ,

বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস, ২০০৫ ইং।

২১শে নভেম্বর ২০০৫ ইং।

দৈনিক আমার দেশ, পৃঃ ১০।

২০। স্কোয়াড্রন লীডার হক রাফিউল মোঃ, পি এসসি,

বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ঃ বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৬ ইং, দৈনিক আমারদেশ, ২১/১১/০৬, পৃঃ ১২।

২১। হোসেন তোফাজ্জল ঃ জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বইমেলা ২০০৭, পৃঃ ৫২৮,

২২। স্কোয়াড্রন লীডার হক রাফিউল মোঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

যদিও আমাদের দেশটি ছোট এবং এর সশস্ত্র বাহিনীর আকারও ক্ষুদ্র, তদুপরি এর পরিচিতি পৃথিবীর অনেক বড় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর চেয়েও অনেক বেশী। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যে সমস্ত দেশ নিয়মিত অংশ গ্রহন করে আসছে এমন কয়েকটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যখন জাতি সংঘ কর্তৃক শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহনের প্রথম প্রস্তাব আসে তখন ইহা বাংলাদেশের জন্য বড় সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।[১] বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হলো বাংলাদেশ।[২] ইহার ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে সবচেয়ে সম্মানজনক ও দায়িত্বশীল অবস্থানে উপনীত হয়।[৩]

১৯৮৮ সাল বাংলাদেশের জন্য নতুন যুগের সূচনা করে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন দুয়ার খুলে দেয়। রক্তক্ষয়ী ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসান তদারক করার জন্য জাতিসংঘ UN Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) গঠন করে। সেই মিশনে বাংলাদেশ পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রথম তাঁর নাম সংযোজন করে।[৪] উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় (Operation Desert Shield/Storm-1991) সম্মিলিত বাহিনীতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের তাৎপর্যপূর্ণ অবদান এবং কর্মকুশলতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশী অফিসার এবং সৈনিকরা জাতিসংঘ শান্তি মিশনের অধীনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর অংশ হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশী সৈন্যরা Kuwait Punargathan এবং Mehni Project-এ দক্ষতার সাথে কাজ করে। গত দশকেই বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী হিসেবে দক্ষতার প্রমান দিয়ে বিশ্বে নিজেদের অবস্থান মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক পর্যায়ে নিয়ে আসে। শান্তিরক্ষা মিশনে পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যাসংকুল ও সংঘাতময় দেশে যেখানে উন্নত দেশের বাহিনীসমূহ কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় সেখানে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রিয় বাংলাদেশের পতাকা বুকে ধরে কাজ করে সুনাম অর্জন করছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থান এখন শীর্ষে।

১৯৮৮ সালে UNIIMOG-এ মাত্র ৩১ জন অফিসার প্রেরনের মাধ্যমে বাংলাদেশ যে মহান ব্রতে নিজেকে জড়িত করে আজ তার পরিমান, পরিধি, পরিচিতি এবং প্রসারতা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের এ যাবৎ ৬১টি শান্তিরক্ষা মিশনের ৩১টি মিশনে বিশ্বের ২৫টি দেশে বাংলাদেশ সৈন্য প্রেরন করেছে।[৫]

কুয়েত পূনর্গঠনসহ শান্তি মিশনে দায়িত্ব পালন করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীরা আজ দক্ষ ও অভিজ্ঞ। যে কোন প্রতিকুল পরিবেশে এবং পরিস্থিতিতে তারা কাজ করতে সক্ষম। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের অংশ গ্রহণকৃত শান্তি মিশনগুলো হলোঃ

UNIIMOG (ইরান-ইরাক), MINURSO (পশ্চিম সাহারা), MONUC (কঙ্গো), ONUMOZ (মোজাম্বিক), UNAMIC/UNTAC (কম্বোডিয়া), UNAMIR (রুয়ান্ডা), UNAMSIL (সিয়েরা লিয়ন), UNAVEM (এঙ্গোলা), UNAVEM-III (এঙ্গোলা), UNGCI (ইরাক), UNIKOM (কুয়েত), UNMEE (ইথিওপিয়া/ইরিত্রিয়া), UNMIH (হাইতি), UNMIK (কসোভো), UNMISET/UNATET (পূর্ব তিমুর), UNMLT (কম্বোডিয়া), UNMOT (তাজিকিস্তান), UNMOVIC (ইরাক), UNOMIG (জর্জিয়া), UNOMIL (লাইবেরিয়া), UNOMUR (উগান্ডা/রুয়ান্ডা), UNOSOM (সোমালিয়া), UNOSOM-II (সোমালিয়া), UNPREDEP (মেসিডোনিয়া), UNPROFOR (বসনিয়া-হার্জেগোবিনা), UNSMA (আফগানিস্তান), UNTAES (ই-স্লোভেনিয়া), UNTAG (নামিবিয়া) ইত্যাদি।

উক্ত মিশনসমূহে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৩৮,০০০ সৈন্য অংশগ্রহণ করেছে।[৬] এদের মধ্যে সেনা, নৌ, বিমান এবং বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্য রয়েছে। আজো জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনীর অধীনে কঙ্গো, সুদান, সিয়েরা লিয়ন, লাইবেরিয়া, আইভরিকোষ্টসহ বিশ্বের ৮টি দেশে ১০ হাজারের অধিক সৈন্য নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০৭ মাত্র ১৯ বছরে বিশ্বের যেখানে প্রয়োজন বিশ্বশান্তি রক্ষায় সেখানেই বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা নিরলসভাবে কাজ করেছে এবং এখনো করে যাচ্ছে। এবং ভবিষ্যতেও যেখানে প্রয়োজন পড়বে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সেখানে কাজ করতে প্রস্তুত রয়েছে।

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দেশের মানুষ এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সাথে মিশে আছে। কারণ এদেশের সশস্ত্র বাহিনীর জন্মই দেশের মানুষের প্রচন্ড দুঃখের দিনে, রক্ত ঝড়া সময়ে। সেই সাথে অগনিত মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা, আবারিত মমতায় ধন্য ও উজ্জীবিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোহিমা

Dhaka University Institutional Repository

গ্যারিসন (দূর্গ) এ War Memorial এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন জেনারেল জ্যাকব তার পুস্তক "Surrender at Dhaka, Birth of a Nation" পুস্তকে। সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে এ উক্তিটির কোন তুলনা হয় না এবং এটি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

When you go home
Tell them of us and say
For your tomorrow
We gave our today.[৮]

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা হয়ে পূর্ব তিমুর পর্যন্ত বাংলাদেশের সৈন্যরা আজ শুধু শান্তিরক্ষীই নয়। মানবতার সৈন্য হিসেবে ও পরিচিতি লাভ করেছে। তাই বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা যেখানে গিয়েছে, সেখানেই সাদরে গৃহীত হয়েছে। যা অনেক ক্ষমতাবান দেশের শান্তি রক্ষীদের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে সোমালিয়া ও জর্জিয়ার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। এই উভয় দেশেই আমেরিকান কিংবা ইউরোপিয়ান শান্তিরক্ষীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে স্থানীয় জনগণের চরম বৈরিতার। অথচ বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা সেখানে দিব্যি তাদের কর্তব্য পালন করেছে। শুধু তাই নয়, শান্তি রক্ষার সাথে সাথে তারা মানবতার জন্য ও কাজ করেছে।

চরম প্রতিকূল অবস্থার প্রেক্ষিতে সোমালিয়া হতে যখন আমেরিকান ও ইউরোপীয় বাহিনী সে দেশ ত্যাগে ব্যস্ত তখন বাংলাদেশী সৈন্যরা (ব্যানব্যাট-২) সোমালি জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বালির বস্তা ফেলে বাঁধ তৈরী করেছেন। একই সময়ে আমাদের ডাক্তাররা পীড়িতদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। সৈন্যরা নিজেদের খাদ্য বাঁচিয়ে অভূক্ত সোমালিদের মুখে তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীনভাবে বাস্তহারাদের নিরাপদ স্থানে পূর্নবাসনের কাজ ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশী সৈনিকরা, যা ছিল এ মিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এসব কারনেই সোমালিদের কাছে যে কোন কন্টিনজেন্ট এর তুলনায় বাংলাদেশের কন্টিনজেন্ট এর গ্রহণ যোগ্যতা ছিল অধিক। অথচ গৃহযুদ্ধে সোমালিয়া এতোই ক্ষত বিক্ষত যে ওয়ার লর্ডদের বদৌলতে সারা দেশ ব্যাপী কোন কেন্দ্রীয় শাসন পর্যন্ত ছিল না। যুদ্ধ সম্পর্কে জনগণের কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। আঞ্চলিক বা গোষ্ঠী প্রধানদের আগ্রাসী ও ক্ষমতা লিপ্সার কারনে এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র।[৯] এই মৃত্যু ভীবিষিকা পূর্ণ ব্যর্থ রাষ্ট্রটিতে ও জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের অধীনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা হয়েছে সফলকাম। যদিও সোমালিয়া সংকট এখনো চলছে। নতুন করে আবার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আবার ক্ষমতার লড়াইয়ে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে দেশটি।

Dhaka University Institutional Repository

জর্জিয়াতে UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) মিশনের অধীনে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানীসহ ২৩টি দেশের সেনা সদস্যরা অংশগ্রহন করলেও জর্জিয়ান ও আবখাজিয়ান জনসাধারনের কাছে গ্রহনযোগ্য ছিল না। পাশাপাশি বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা ছিল সবার কাছে গ্রহনযোগ্য। শুধু সোমালিয়া বা জর্জিয়ায় নয় বাংলাদেশী সৈন্যরা ইরিত্রিয়ায় ভূমি মাইন অপসারণ করেছে, এ্যাংগোলা ও লাইবেরিয়াতে রাস্তা মেরামত ও সেতু স্থাপন করেছে, কঙ্গোতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছে। এ সব কাজের মাধ্যমে তারা বিশ্ববাসীসহ স্থানীয় জনসাধারনের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।[১০] সিয়েরা লিওনের অনেকেই আজ বাংলা গান গাইতে পারে, লাইবেরিয়াতে স্কুলের নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশী মেজর ফজলের নামে, জর্জিয়াতে প্রতি বছর ৯ই মার্চ পালন করা হয় লেঃ কর্নেল মোঃ হোসাইনের মৃত্যু দিবস। এ সবই আমাদের দেশের শান্তিরক্ষীদের প্রতি ঐসব দেশের সাধারণ মানুষের ভালবাসার নিদর্শন।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের শান্তিরক্ষীরা দেশের জন্য কুড়িয়ে এনেছে অনেক বিরল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আজকে বাংলাদেশের সৈন্যরা বিশ্বব্যাপী উচুঁ মানের ডিসিপ্লিন্ড সৈনিক হিসেবে প্রশংসিত। শান্তিরক্ষী হিসেবে কোন দেশে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় অন্য যে কোন দেশের সৈনিকদের তুলনায় বাংলাদেশী সৈনিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সবচেয়ে কম। এ প্রসঙ্গে ২০০৫ সালের ১লা মার্চ আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিটির সামনে আন্তর্জাতিক সংগঠন কর্মকান্ডের সহকারী সচিব কিম আর হোমসের প্রদেয় বিবৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিটির চেয়ারম্যান ও তার সদস্যদের সামনে সেদিন বিবৃতি প্রদানকালে মিঃ হোমস কঙ্গোতে শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত ৯ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীর কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন, যারা ঐ বছরের ২৪শে ফেব্রুয়ারী শান্তিরক্ষার মহান ব্রতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী তথা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি এসেছিল খুব সম্ভবত ২০০১ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব কফি আনানের বাংলাদেশ সফরকালে। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা স্মরণ করে মহাসচিব কফি আনান বলেছিলেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের একটি মডেল সদস্য যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন ও অন্যান্য ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশ সমূহের নেতৃত্ব দিচ্ছে ও মানবিক কর্মকান্ডে বিশেষ অবদান রাখছে। জনাব কফি আনানের এই প্রশংসাবানী আরো অনেকের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনীত হয়েছে। ২০০৬ সালের জুনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের নব নিযুক্ত রষ্ট্রদূত জ্যাকস আন্দ্রে কসটিলস্ বলেছিলেন, শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য প্রেরনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। প্রায় একই সময়ে দৈনিক অবজারভারের সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনার ডেভিড স্প্রল জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ ও কানাডার অনুরুপ ভূমিকার উল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যারী কে টমাস ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত এসকো কেন্টর সিনস্কি জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ আজ এক অনুকরনীয় অবস্থানে আরোহন করেছে যা কিনা অন্য যে কোন দেশের জন্য অনুপ্রেরনার কারন হতে পারে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে BIPSOT (বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং) নামক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শান্তিরক্ষীরা প্রশিক্ষণ গ্রহন করতে আসে। অতি অল্প সময়ে এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিকভাবে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছিলেন জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব জনাব কফি আনান।[১১]

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের বর্তমান অনন্য অবস্থান অর্জনের পেছনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক অংশ গ্রহনের পাশাপাশি নৌ, বিমান ও বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর অংশ গ্রহন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৫.১ মধ্যপ্রাচ্যে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকাঃ

জাতিসংঘ তার সূচনালগ্ন থেকেই মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সাথে জড়িত। এই মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করেই জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ধারনা জন্ম লাভ করেছে এবং বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সফলতা ব্যর্থতা আজকের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিগত প্রায় ৬ দশকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শান্তিপূর্ণ নিস্পত্তির জন্য নীতিমালা উদ্ভাবন করেছে। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্যালেষ্টাইন সংঘাতকে কেন্দ্র করে UNTSO (UN Truce Supervision Organization) [১২] এবং ১৯৫৬ সালে মিশর ইসরাইল সংঘাতকে কেন্দ্র করে মিশরের সিনাই উপদ্বীপে প্রথম UNEF (United Nations Emergency Force)[১৩] গঠিত হয়েছে। যদিও প্রথমটা ছিল পর্যবেক্ষক মিশন এবং দ্বিতীয়টা ছিল প্রকৃত পক্ষে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম। বাস্তবিক পক্ষে দুটারই জন্ম হয়েছে মধ্য প্রাচ্যের মাটিকে কেন্দ্র করে। তারপর ১৯৫৮ সালে লেবানন ইসরাইল বিরোধকে কেন্দ্র করে UNOGIL (UN Ovservation Group in Lebanon), ১৯৬৩ সালে ইয়েমেনে UNYOM (UN

Dhaka University Institutional Repository

Yeman Ovservation Mission), ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় বারের মতো মধ্যপ্রাচ্যে UNEF-II (UN Emergency Force), ১৯৭৪ সালে সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে UNDOF (UN Disengagement Observer Force), ১৯৭৮ সালে UNIFIL (UN Interin Force in Lebanon,) ১৯৮৮ সালে UNIIMOG (UN Iran-Iraq Military Observer Group), ১৯৯১ সালে UNIKOM (UN Iraq Kuwait Observer Mission), ১৯৯৬ সালে UNGCI (UN Guards Contingent in Iraq) গঠিত হয়।[১৪] এ ছাড়া গত জুলাই আগষ্টে (২০০৬) ইসরাইল ও দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ গেরিলাদের মধ্যে সংগঠিত যুদ্ধের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব ১৭০১ (২০০৬) মোতাবেক লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয়।[১৫]

জাতিসংঘের উপরিউক্ত মিশন বা কার্যক্রমগুলোর দিকে চোখ রাখলেই অনুমান করা যায় মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা কত নাজুক এবং সংঘাতময় এবং সেখানে জাতিসংঘের উপস্থিতি কতো ব্যাপক এবং জরুরী। এই সংঘাতময় অঞ্চল থেকেই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে UNIIMOG (Iran-Iraq Military Observer Group) মিশনে বাংলাদেশ যোগদানের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে প্রথম নিজের নাম লিপিবদ্ধ করে। দীর্ঘকালব্যাপী ইরান-ইরাক যুদ্ধাবসানের পর যুদ্ধবিরতি ও অন্যান্য বিষয়াবলী তদারক করার জন্য এই মিশন গঠিত হয়।[১৬] নিম্নে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ননাসহ এই মিশনের কার্যক্রম ও বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরা হলোঃ

৫.২ ইরান-ইরাক যুদ্ধ ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমঃ

মধ্যপ্রাচ্যের দুই ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশ ইরান এবং ইরাক ১৯৮০ সালের ১০ইং সেপ্টেম্বর একে অন্যের বিরুদ্ধে এক ভয়ানক যুদ্ধ শুরু করে ।[১৭] প্রায় ৮ বছর ব্যাপী এই যুদ্ধ উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। মূলত শাত-ইল-আরব জলপথকে কেন্দ্র করেই এই যুদ্ধের সূচনা। ১৯৭৫ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে ইরান ও ইরাকের মধ্যে শাত-ইল-আরব জলপথ সহ বিভিন্ন বিতর্কিত সীমানা সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিরোধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭৫ এর পর উভয় দেশেই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে। ১৯৭৯ সালে ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের ফলে শাহের রাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে। একই বছর ইরাকের বাথ পার্টির জনপ্রিয় এবং শীর্ষ নেতা সাদ্দাম হোসেন প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্কের ও অবনতি ঘটে। যার পরিনতিতে

Dhaka University Institutional Repository

উভয় দেশ ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে কুয়েত ও সৌদি আরবসহ ফ্রান্স, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে অর্থ, অস্ত্র, তথ্য ও প্রযুক্তিসহ সব রকমের সহযোগিতা দিতে থাকে।[১৮]

১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে ইরান ও ইরাকের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকেই তা বন্ধের জন্য জাতিসংঘের প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১০ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে ২২শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কুর্ট ওয়ার্ল্ড হেইম উভয় দেশকে সংযম প্রদর্শনের আহবান জানান। আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তিতে উপনীত হবার জন্য তিনি মধ্যস্থতা করার ও প্রস্তাব দেন। তিনি নিরাপত্তা পরিষদকে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করার অনুরোধ জানান। পরিষদ ২৮ সেপ্টেম্বর বৈঠকে ইরান ও ইরাককে পূনরায় বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকার এবং মধ্যস্থতা মেনে নেয়ার অথবা সমঝোতা প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়।

১৯৮২ সালে পরিষদ মধ্যস্থতা প্রচেষ্টায় পুনরায় সমর্থন ব্যক্ত করে যুদ্ধ বিরতি পর্যবেক্ষন করার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠানোর আহবান জানায়। একই বছর সাধারণ পরিষদ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানায় সৈন্য সরিয়ে নেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পরিষদ যুদ্ধ অব্যাহত থাকতে সাহায্য করে এমন যে কোন কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য সকল দেশের প্রতি আহবান জানায়।[১৯]

এই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘাত বন্ধের জন্য নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে ৭টি প্রস্তাব গ্রহন করে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাবগুলোতে যে সব আহবান জানানো হয় তা হচ্ছেঃ

১। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমান্ত থেকে সৈন্য অপসারণ,

২। অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান বন্ধ,

৩। আন্তর্জাতিক জলপথে অবাধ চলাচল ও বাণিজ্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন,

৪। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি, নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক জীবনের প্রতি হুমকী সৃষ্টি করতে পারে এমন সব আচরন থেকে বিরত থাকা।

৫। যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা,

৬। একটি পূর্নাঙ্গ, ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক নিস্পত্তি অর্জনে মহাসচিব ও তাঁর বিশেষ প্রতিনিধির প্রচেষ্টার প্রতি পরিষদ সমর্থন জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সালের এপ্রিলে তৎকালীন মহাসচিব হ্যাভিয়ের পেরেজ দ্য কুয়েলার তেহরান ও বাগদাদ সফর করেন। সেখানে তিনি আগের মাসে পেশ করা পরিকল্পনা নিয়ে দুই সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেন।

সনদ অনুযায়ী মহাসচিবের দায়িত্ব হচ্ছে যুদ্ধ অবসানের চেষ্টা করা এবং এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানব কল্যাণ আইন অনুযায়ী যুদ্ধে যাতে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার না হয়, যুদ্ধ বন্দীরা যাতে চিকিৎসা পায়, জাহাজ ও বেসামরিক বিমান চলাচল যাতে বিঘ্নিত না হয় তার চেষ্টা করা। এ সবের ভিত্তিতেই মহাসচিব তার প্রস্তাব পেশ করেন।

১৯৮৪ সালের মার্চ ও ১৯৮৮ সালের আগষ্টের মধ্যে মহাসচিব রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে ইরান অথবা ইরাকের অভিযোগ তদন্তের জন্য ৭টি মিশন পাঠান। তাদের রিপোর্টে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। নিরাপত্তা পরিষদ বিষাক্ত গ্যাস ও জীবানু অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধকারী ১৯২৫ সালের জেনেভা প্রটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার আহবান জানান। অসামরিক এলাকায় হামলার অভিযোগ এবং যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক বন্দীদের প্রতি আচরণ তদন্তের জন্য ঐ অঞ্চলে আরো তথ্য অনুসন্ধানে মিশন পাঠান।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে মহাসচিব যুদ্ধ অবসানের পদক্ষেপ খুঁজে বের করতে একযোগে কাজ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহবান জানান। ঐ মাসের শেষ দিকে মহাসচিব তার অফিসে নজীর বিহীন এক বৈঠকে ১৫টি সদস্য দেশের সামনে একটি শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯৮৭ সালের ২০শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে ৫৯৮ (১৯৮৭) নম্বর প্রস্তাব গ্রহন করে। এক বছর পর এটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তির কাঠামোতে পরিনত হয়।[২০]

প্রস্তাবে, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আশু যুদ্ধ বিরতি এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানায় সৈন্য সরিয়ে নেয়ার আহবান জানানো হয়। এতে যুদ্ধ বিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার তদারক করার উদ্দেশ্যে একদল পর্যবেক্ষক পাঠানোর জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দানের আহবান জানানো হয়। প্রস্তাব বাস্তবায়ন ও অমীমাংসিত সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি অর্জনে মধ্যস্থতা প্রচেষ্টায় মহাসচিবকে সহযোগিতা করার জন্য ইরান ও ইরাকের প্রতি আহবান জানানো হয়। যুদ্ধের জন্যে কে দায়ী তা তদন্তের উদ্দেশ্যে একটি নিরপেক্ষ কমিটির উপর দায়িত্বভার অর্পনের প্রশ্নটি খতিয়ে দেখার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

মহাসচিবকে অনুরোধ করা হয়। পুন নির্মান উদ্যোগের প্রতি স্বীকৃতি দান করা হয় এবং ঐ অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জোরদারের ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখার অনুরোধ জানানো হয়।

১৯৮৭ সালের ২৩ জুলাই ইরাক প্রস্তাবটি মেনে নেয়। ১৯৮৮ সালের ১৭ জুলাই ইরান প্রস্তাবটি গ্রহন করেছে বলে মহাসচিবকে জানায়। নিউইয়র্কে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার পর মহাসচিব একটি ফর্মূলা উদ্ভাবন করেন। এর ভিত্তিতে মহাসচিব ১৯৮৮ সালের ৮ আগষ্ট ঘোষনা দিতে সক্ষম হন যে, ২০ আগষ্ট যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হবে। মহাসচিবের উদ্যোগে এর পর দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে সরাসরি আলোচনা হয়।

১৯৮৮ সালের ৯ আগষ্ট নিরাপত্তা পরিষদ প্রাথমিকভাবে ছয় মাসের জন্য জাতিসংঘ নিরস্ত্র ইরান-ইরাক সামরিক পর্যবেক্ষক গ্রুপ (UNIIMOG) গঠন করে UNIIMOG এ সামরিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। সেই সঙ্গে ছিল সামরিক ও বেসামরিক স্টাফ। এদের অগ্রবর্তী দলটিকে ইরান ও ইরাকে পাঠানো হয় ১০ আগষ্ট ১৯৮৮ সালে।

১৯৮৮ সালের ২৫ আগষ্ট ও ১৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব ও তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির উদ্যোগে বেশ কয়েক দফা দুদেশের মন্ত্রী পর্যায়ে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এসব আলোচনায় নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ (১৯৮৭) নম্বর প্রস্তাবের অন্যান্য ধারা এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সময় সম্পর্কে সমঝোতার প্রয়াস চালান হয়। ১৯৮৮ সালের ১ অক্টোবর এবং ৩১ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত আরো আলোচনা হয়।

অসুস্থ ও আহত যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান ও প্রত্যাবাসন প্রশ্নে ১৯৮৮ সালের ১৪ নভেম্বর আন্তঃ রেডক্রস কমিটির (ICRC) সঙ্গে ইরান ও ইরাক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। যুদ্ধে নিহতদের লাশ ও বিনিময় করা হয়।

১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে মহাসচিবের তত্বাবধানে দুদেশের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আরো আলাপ আলোচনা হয়। ১৯৯০ সালের নভেম্বর নাগাদ উভয় পক্ষ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সীমানায় সৈন্য সরিয়ে আনা প্রায় সম্পন্ন করে। UNIIMOG সৈন্য প্রত্যাহার কাজ তদারক ও স্থানীয়ভাবে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হলে তা মীমাংসা করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সৈন্য প্রত্যাহার সম্পন্ন হয় এবং নিরাপত্তা পরিষদ UNIIMOG এর ম্যান্ডেট রদ ঘোষনা করে।[২১]

ক. UNIIMOG মিশনের সাংগঠনিক ধারনা

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৫৯৮ (১৯৮৭) নম্বর প্রস্তাব অনুসারে এই মিশন গঠিত হয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য দেশ থেকে সামরিক সদস্যের সমন্বয়ে মহাসচিবের নিয়ন্ত্রনাধীন এটা ছিল একটা স্বতন্ত্র সামরিক ইউনিট। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার মেজর জেনারেল স্লাভকো যোভিক এই মিশনের প্রথম মিলিটারী অবজারভার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই মিশনের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করেছিল আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ঘানা, হাঙ্গেরী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, ইতালী, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, নাইজেরিয়া, নরওয়ে, পেরু, পোল্যান্ড, সেনেগাল, সুইডেন, তুরস্ক, উরুগুয়ে, যুগোশ্লাভিয়া এবং জাম্বিয়া এবং ইরান ও ইরাকী সিভিলিয়ানদের সমন্বয়ে। আগষ্ট ১৯৮৮ সালের প্রথম দিনে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী ছিল ৪০০ জন, এর মধ্যে ৩১৭ জন ছিল মিলিটারী অবজারভার।[২২] UNIIMOG এর হেডকোয়ার্টার ইরান এবং ইরাকে দুই গ্রুপে বিভক্ত ছিল। অপারেশন এলাকার ৭টি সেক্টর ছিল। যার মধ্যে ৪টি ছিল ইরানে এবং ৩টি ছিল ইরাকে। ৭০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার এলাকা পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব ছিল একেক সেক্টরের।[২৩]

খ. UNIIMOG মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ইরান ও ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের সাথে জাতিসংঘ মহাসচিবের ফলপ্রসু আলোচনার পর UNIIMOG গঠিত হয়। ১৯৮৮ সালের ২০ আগষ্ট যুদ্ধবিরতি তদারক করার জন্য এই মিশন কার্যক্রম শুরু করে। জাতিসংঘ প্রথম বারের মত এই মিশনে অংশ গ্রহনের আমন্ত্রন জানায় বাংলাদেশকে। এটা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটা সম্মান ও মর্যাদার বিষয় ছিল। অন্য কথায় বলা যায় বহিঃ বিশ্বে বাংলাদেশের কুটনৈতিক সাফল্যের ধারাবাহিকতার ফসল ছিল এই আমন্ত্রন এবং বাংলাদেশের যোগদান। বাংলাদেশের মোট ৩১ জন সামরিক পর্যবেক্ষক এই মিশনে অংশ গ্রহন করে এবং মিশনের সমাপ্তি পর্যন্ত তারা সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। এই মিশনে জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ছিলেন সুইডেনের জেন,কে, এলিসন। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এই মিশনের চীফ মিলিটারী অবজারভার ছিলেন যুগোশ্লোভিয়ার মেজর জেনারেল স্লাভকো যোভিক। নভেম্বর

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ থেকে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত চীফ মিলিটারী অবজারভার ছিলেন বাংলাদেশের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস এনাম খান।[২৪] ১৯৮৮ সালের আগষ্ট মাসে শুরু হয়ে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই মিশনের সমাপ্তি ঘটে।

UNIIMOG-এ অংশ গ্রহণ করার সময়ে বাংলাদেশ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে ছিল অনভিজ্ঞ। বাংলাদেশী সৈনিকদের এ ব্যাপারে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না। বাংলাদেশ ছিল এক্ষেত্রে নতুন মুখ। পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন নতুন মুখ হওয়া সত্বেও সাহসিকতায়, কর্মদক্ষতায়, পেশাদারিত্বপূর্ণ মনোভাব এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল অনেকের উপরে । অনেক পুরনো অভিজ্ঞ দেশকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ অনেক পূর্বেই। শান্তির প্রতি মনোভাব, নিরপেক্ষ এবং কর্মকুশলতার স্বীকৃতি প্রথম মিশনেই পেয়ে গেছে বাংলাদেশ। যার ফলে এতো বড় বড় এবং শক্তিশালী দেশের অফিসার থাকা সত্বেও একজন বাংলাদেশী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রথম মিশনেই দুইজন চীফ মিলিটারী অবজারভারের দ্বিতীয় জন হয়েছিলেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহণ করেই এই প্রাপ্তি একটি নবীন, ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র দেশের জন্য কম মর্যাদার বিষয় নয়। এর ফলেই পরবর্তী সময়ে বিশ্বের যেখানেই শান্তি সৈনিকের প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই বাংলাদেশের নাম উচ্চারিত হয়েছে, বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ডাক পড়েছে।

৫.৩ ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ এবং UNIKOM

১৯৯০ সালের ২ আগষ্ট ইরাকী বাহিনী কুয়েত আক্রমন করে। ইরাক -ইরান যুদ্ধের পটভূমিতেই ইরাক কুয়েত আক্রমন এবং দখল করেছিল। মূলত ইরানের ইসলামিক রেভ্যুলিউশনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইন্ধন যুগিয়েছিল। শাত-ইল-আরবের দাবির অজুহাতে যখন ইরাক-ইরান যুদ্ধ শুরু করেছিল তখন তেহরানে মার্কিন পনবন্দীদের মুক্তি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র। তখনই সাদ্দাম হোসেনকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, আর এতে অর্থ যোগান দিচ্ছিল সৌদি আরব ও কুয়েত সহ উপসাগরীয় দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো যুদ্ধে ইরাককে সব রকমের সহযোগিতা সহ ভবিষ্যৎ সমর্থনের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। ইরান-ইরাক যুদ্ধের পর সৌদি আরব ও কুয়েত সহ বিভিন্ন দেশ ইরাককে যুদ্ধের খরচ বাবদ অতিরিক্ত তেল উৎপাদন ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করায় সাদ্দাম হোসেন ওয়াশিংটনের শরণাপন্ন হয়ে সহানুভূতি পাননি।

Dhaka University Institutional Repository

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ছিল রুমালিয়ার বিতর্কিত তেলক্ষেত্র দখলের অজুহাতে গোটা কুয়েত দখল। ওয়াশিংটন-এ পরিকল্পনা আগে থেকে টের পেয়েও ইরাককে নিবৃত্ত করেনি।[২৫]

২ আগষ্ট ইরাকী বাহিনী কর্তৃক কুয়েত দখলের ১১ ঘন্টা পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এর নিন্দা করে এবং অবিলম্বে ইরাকি বাহিনী কুয়েত থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ৬ আগষ্ট পরিষদ ইরাক ও অধিকৃত কুয়েতের বিরুদ্ধে ব্যাপক বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।[২৬]

এ ছাড়া ১৯৯০ সালের আগষ্ট ও অক্টোবরের মধ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ বেশ কিছু সংখ্যক প্রস্তাব গ্রহন করে। এগুলো হলোঃ

(ক) কুয়েত থেকে ইরাককে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বলা হয়,

(খ) কুয়েত ইরাকের সাথে একীভূত করাকে বাতিল ঘোষনা করা হয়,

(গ) ইরাক ও কুয়েতে বিমান পরিবহন নিষিদ্ধ করা হয়,

(ঘ) ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যাপক বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, এবং

(ঙ) নিষেধাজ্ঞা বলবতের জন্য নৌ-অবরোধের অনুমোদন করা হয়।[২৭]

সাধারণ পরিষদের ৪৬তম অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর -অক্টোবর) সাধারণ বিতর্কে বিশ্বের সকল অংশের প্রতিনিধিরা ১৫৫টি ভাষন দেন। এসব ভাষনের মধ্যে একটি বাদে সবগুলোতেই ইরাকী আক্রমন ও আগ্রাসনের নিন্দা করা হয়। অধিবেশনে বিশ্ব জনমতের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২৯ নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ ৬৭৮ (১৯৯০) নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরাক কর্তৃক পরিষদের প্রস্তাবসমূহ মেনে চলার জন্য ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারী পর্যন্ত সময় সীমা বেঁধে দেয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ইরাক মেনে নেয়নি। কুয়েতের সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোটবদ্ধ কোয়ালিশন বাহিনী ১৬ জানুয়ারী ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শুরু করে। ২৪ ফেব্রুয়ারী মূল হামলা শুরু হয়। কোয়ালিশন বাহিনী পরিষদের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কাজ করে, জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রনে বা নির্দেশনায় থেকে নয়। ২৮টি দেশের সম্মিলিত কোয়ালিশন বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমনে ২৭ ফেব্রুয়ারী নাগাদ ইরাকী বাহিনী বাধ্য হয়ে কুয়েত ত্যাগ করলে যুদ্ধ বন্ধ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ সালের ৯ এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদ দুই দেশের মধ্যবর্তী ২০০ কিলোমিটার অসামরিক অঞ্চল পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ ইরাক-কুয়েত পর্যবেক্ষক মিশন (UNIKOM) গঠন করে। ৬মে এই মিশন পুরাপুরি মোতায়েন করা হয়। এর অনুমোদিত শক্তি ছিল ৩০০ নিরস্ত্র সামরিক পর্যবেক্ষক এবং ২০০ অন্য সামরিক লোক। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘ বিশেষ কমিশন (UNSCOM) গঠন করে। এই কমিশনের কাজ হচ্ছে যে কোন সময় ও বিনা বাঁধায় ইরাকের জীবানু, রাসায়নিক ও ক্ষেপনাস্ত্র সামর্থ পরীক্ষা করা। সেগুলোর ধ্বংস, অপসারন অথবা নিস্ক্রীয়করণ নিশ্চিত করা।[২৮]

৫.৪ কুয়েত পুনর্গঠন কার্যক্রম

উপসাগরীয় যুদ্ধের পরক্ষণেই জাতিসংঘ ইরাক কুয়েত সীমান্তে অস্ত্র বিরতি এবং সৈন্য মুক্ত এলাকায় পর্যবেক্ষণ মিশন (Iraq-Kuwait Observer Mission-UNIKOM) শুরু করে। যুদ্ধের পরই স্থলমাইন অপসারন এবং কুয়েত সিটির পূনর্গঠন সহ কুয়েত অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হয়। কুয়েত সরকার সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট সৈন্য সহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চায়, বাংলাদেশ সরকার এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। পরবর্তী সময়ে কুয়েত পুনর্গঠনে এবং কুয়েতের দক্ষ জনশক্তি গঠনে অবদান রাখে যা কুয়েত পুনর্গঠন (OKP) এবং মিনি প্রজেক্ট নামে পরিচিত।

১০ নভেম্বর ১৯৯১ বাংলাদেশ সরকার এবং কুয়েত সরকারের মধ্যে (Memorandum of Understanding-MOU) সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার ৭টি প্রজেক্টে লোক নিয়োগ করে যা (Operation Kuwait Punargathon) OKP ১-৭ নামে পরিচিত।

বিগত ৯ বৎসরের বেশী সময়ে বাংলাদেশ ৭টি প্রজেক্টে ৮,৬৮৭ লোক কুয়েত পুনর্গঠনে অবদান রাখে। এই সমস্ত প্রজেক্ট ২০০১ সালের জুন মাসে ভালভাবে শেষ হয়। কুয়েত পুনর্গঠন কাজের একটা বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

Number of personnel who completed the projects

Ser	Name of Project	Strength Participated			
		Army	Navy	Air force	Total
1	Operation Kuwait Punargathon (OKP) 1-7	8,642	21	24	8,687

Number of Personnel Currently on

Deputation to OKP

Ser	Name of Projects	Status	Strength									Total
			Army			Navy			Air Force			
			Offer	Or	CIV	Offer	Or	CIV	Offer	Or	CIV	
1	LHQ	Deputation	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	OKP-1 (EOD)	Deputation	5	238	-	-	-	-	-	-	-	243
3	OKP-3 (EME)	Deputation	1	99	-	-	-	-	-	-	-	100
4	OKP-4 (Ord)	Deputation	3	59	-	-	-	-	-	-	-	62
5	OKP-5 (AMC)	Deputation	64	103	-	-	7	-	-	8	-	200
6	OKP-6 (MCCS)	Deputation	5	-	-	1	-	-	-	-	-	6
	Total		82	500	-	1	7	-	-	8	-	602

Dhaka University Institutional Repository

Operation Kuwait Punargathon হতে

বাংলাদেশের আয়

কুয়েত সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী কুয়েত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় OKP সদস্যের বেতন ভাতা প্রদান করে। এই মিশন থেকে বাংলাদেশের মোট আয় হয় ৯২,৮৮,৫২,০০০/- টাকা।

OKP তে বাংলাদেশ সেনা সদস্যদের বেতন স্কেল নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো ঃ

Rank	Monthly Pay in Kuwaiti Diner (KD)
Colonel and equivalent	722
Lieutenant colonel and equivalent	643
Major and equivalent	565
Captain and equivalent	481
1st Lieutenant and equivalent	403
2nd Lieutenant and equivalent	364
Master Warrant Officer an equivalent	406
Senior Warrant Officer and Equivalent	375
Warrant Officer and Equivalent	339
Sergeant and equivalent	318
Corporal and equivalent	282
Lance Corporal and equivalent	262
Sainik and equivalent	247

Dhaka University Institutional Repository

Skilled Technical Manpower to Kuwait (STMK)

OKP-র বিভিন্ন প্রজেক্টে বাংলাদেশী ইউনিটের সফলতা ও আত্ম উৎসর্গে কুয়েত সরকার সন্তুষ্ট হয়ে বাংলাদেশকে Skilled Technical Manpower to Kuwait (STMK) নামে একটি বিশেষ প্রজেক্ট দেয়। এই প্রজেক্ট গঠিত হয় কর্তব্যরত ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক ও বিভিন্ন পেশার লোকদের নিয়ে। STMK চুক্তি ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ও কুয়েত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই বাংলাদেশীরা কুয়েত সেনাবাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করে। এই প্রজেক্টের অধীনে প্রথম ৬,০৭৭ সদস্য কুয়েতে গমন করে।

Mehni Project and Security Guard

১৯৯২ সাল হতে কুয়েত সরকার STMK এর সাথে মিনি প্রজেক্ট নামে আর একটি নতুন প্রজেক্ট সংযোজন করে। এই প্রজেক্টে সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত অদক্ষ লোকদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।এই প্রজেক্টের অধীনে প্রত্যেককে ব্যক্তিগত পদবী অনুযায়ী ১০০ KD করে বেতন দেয়া হয়। জানুয়ারি ২০০০ সালে 'Security Guard' হিসেবে ২১৬ সেনা সদস্য কুয়েত গমন করে। যতদূর সম্ভব দুই বৎসর মেয়াদী চুক্তি অনুযায়ী তাদের নিয়োগ দেয়া হয়। The number of soldiers deputed under STMK / Mehni / Security guard project are given below :

Completed Projects

Ser	Name of projects	Strength Participated			
		Army	Navy	Air force	Total
1.	Skilled and Technical Manpower to Kuwait/MEHNI	2,653	276	137	3,066

Dhaka University Institutional Repository

On going Projects

Ser	Name of Projects	Status	Strength									Total
			Army			Navy			Air Force			
			Offer	or	CIV	Offer	or	CIV	Offer	or	CIV	
1.	STMK/MEHNI	Deputation	-	1546	506	-	286	78	02	306	121	2,844
2.	Security Guard	Deputation	3	213	-	-	-	-	-	-	-	216
Total			3	1,758	506	-	286	78	02	306	121	3,060

কুয়েত পূর্নগঠন অভিযানে বাংলাদেশের মোট ১৭ জন সৈন্য প্রাণ হারায় এবং মোট ২৫ জন বিভিন্নভাবে আহত হয়।

Operation kuwait punargathon-এর পর্যালোচনার শেষে বলা যায় বাংলাদেশের সেনা সদস্যরা কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় দ্বারা বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক সকলের জন্য সুনাম ও যশ বহন করে এনেছে। এ সৈন্যরা জাতিসংঘ এবং কুয়েত সেনাবাহিনীর অধীনে কাজ করে বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার দায়িত্বে রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী ও উপসাগরীয় পূনর্গঠন হতে বাংলাদেশের মোট আয় হয়েছে ৬৬১,৯৭,৩৩১৭১/- টাকা।[১৯]

৫.৫ আফ্রিকায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকাঃ

অন্ধকার মহাদেশ বলে খ্যাত আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এর সুফল লাভে ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত, বর্নগত এবং ধর্মীয় হানাহানির কারনে সামরিক হস্তক্ষেপ এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ফলে কার্যত কোন কোন রাষ্ট্র সম্পূর্ণরুপে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রশাসনিকভাবে ব্যর্থ এই রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের জীবন, মান, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের কোন মূল্যই নেই। এখানে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত, গণতন্ত্র বিসর্জিত। উপজাতীয় নেতা, সামরিক স্বৈরাচার বা ওয়ার লর্ডদের বদৌলতে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র থেকে বঞ্চিত। এই সমস্ত ব্যর্থ

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রগুলোতে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রম জনসাধারনের জন্য ত্রাণকর্তা হিসেবে আভির্ভূত হয়। বিশ্বব্যাপী ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী প্রেরনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই কালো মানুষদের মাঝে নিজেদের একটি স্থায়ী আসন তৈরী করে নেয়। যার ফলে বাংলাদেশ আজ দেশে-বিদেশে সমাদৃত ও প্রশংসিত। কঙ্গো, সুদান, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, সোমালিয়া, লাইবেরিয়া, মোজাম্বিক ও সিয়েরা লিওন সহ জাতিসংঘের অধীনে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশ অংশ গ্রহন করেছে। এবং সর্বক্ষেত্রেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে চলছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। এবং শেষে Case Study হিসেবে সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা বিশ্লেষন করা হলো :

৫.৬ কঙ্গোতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা

অন্ধকার মহাদেশের জঙ্গলের দেশ কঙ্গোর কথায় আসা যাক। সাম্প্রতিক কালে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে দায়িত্ব পালনকালে বিদ্রোহীদের এক নৃশংস হামলায় শহীদ হন আমাদের নয় জন বীর শান্তিরক্ষী সেনানী।[৩০]

মধ্য আফ্রিকার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো একটি বিশাল দেশ। আয়তনে প্রায় পশ্চিম ইউরোপের সমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত দেশ উপনিবেশিক শাসন-শোষন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে, কঙ্গো তাদের মধ্যে অন্যতম।[৩১] দেশটি বেলজিয়ামের কাছ থেকে ১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর পরই শুরু হয় জাতিগত কলহ এবং শাসকের রদবদলের পালা । যার ফলে প্রাকৃতিক আর খনিজ সম্পদে ভরপুর হওয়া সত্বেও দেশের জনগণ এর সুফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মবুতু সেসে সেকো ক্ষমতা দখল করে দেশের প্রেসিডেন্ট হন। শুরু করেন একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। যার ফলে কতিপয় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ছাড়া অধিকাংশ জনগণের আশা আকাঙ্খা উপেক্ষিত হয়। ১৯৯৭ সালে লরেন্ট কাবিলা পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশের সহায়তায় মবুতুর দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হন। সুযোগ বুঝে পার্শ্ববর্তী দেশের সৈন্যরা সেখানে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপে তারা কঙ্গো ছাড়তে বাধ্য হলেও জাতিগত কলহের প্রসার ঘটিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

কঙ্গোর এমনি একটি জায়গার নাম হলো ইতুরী। দেশের উত্তর-পূর্ব কোনে অবস্থিত ইতুরী এলাকায় হেমা ও লেন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ একটি দীর্ঘদিনের ইতিহাস। কঙ্গোর রাজধানী কিনসাসার কর্নধারদের নিকট ইতুরী সমস্যার তেমন গুরুত্ব ছিল না।

২০০৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে ইতুরীতে হেমা ও লেন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ চরম আকার ধারন করে। ফলে হাজার-হাজার প্রাণের অবসান ঘটে এবং আরো হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন ও বাস্তচ্যুত হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইউরোপের কয়েকটি দেশ তাৎক্ষনিকভাবে (Interin Emergency Multinational Force) অন্তবর্তীকালীন জরুরী বাহিনী মোতায়েন করে। কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ দেশই ইতুরীর মত বিপদ সংকুল এলাকায় সৈন্য মোতায়েন করতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু বাংলাদেশের বীর সেনানীরা পিছপা হয়নি। ২০০৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ইউরোপীদের কাছ থেকে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা ইতুরীর দায়িত্বভার গ্রহন করে। ব্যানব্যাট-১ এর নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইতুরীর রাজধানী বুনিয়া এলাকায় অল্পদিনের মধ্যেই শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে। পরিস্থিতি যখন অনুকূল হতে থাকে তখন অন্যান্য দেশ ও ইতুরীতে সৈন্য পাঠাতে শুরু করে এবং গঠিত হয় ইতুরী ব্রিগেড।

এক বছর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করার পর নিয়মানুযায়ী ব্যানব্যাট-১ দেশে ফিরে আসে এবং ব্যানব্যাট-২ এর স্থলাভিষিক্ত হয়। বুনিয়া এলাকায় পূর্ন শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর জাতিসংঘ বাহিনীকে দূর-দূরান্তে মোতায়েন করা হতে থাকে। কয়েকশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত দুর্গম পাহাড় ঘেরা জংগলাকীর্ণ এলাকায় শুরু হয় নিরস্ত্রীকরনের কাজ। ২০০৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হতে আনুষ্ঠানিকভাবে নিরস্ত্রীকরণের যাত্রা শুরু হয়। অধিকাংশ মিলিশিয়া বাহিনী নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ায় সাড়া দিয়ে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসে। কিন্তু চরমপন্থী কয়েকটি দল এই শান্তি প্রক্রিয়া নস্যাৎ করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশও তাদের হীন স্বার্থসিদ্দির জন্য চরমপন্থীদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু জাতিসংঘ বাহিনী এ সমস্ত অসহযোগি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান পরিচালনা করে জোর পূর্বক নিরস্ত্রীকরণের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

২০০৪ এর ডিসেম্বরে লেন্দু সম্প্রদায়ের মিলিশিয়া (এফ এন আই) হেমা মিলিশিয়াদের উপর ক্রমাগত আক্রমন চালাতে থাকে। হঠাৎ লেন্দু সম্প্রদায়ের এই শক্তি বৃদ্ধিতে অতি অল্প সময়ে অনেক প্রাণের অবসান ঘটে। বাস্তহারা হয়ে জঙ্গল অথবা লেক পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় নেয় অনেক

Dhaka University Institutional Repository

নিরীহ জনগণ। ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় কঙ্গোতে অবস্থানরত জাতিসংঘ বাহিনীর কর্মদক্ষতা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতিসংঘ ইতুরীতে তিনটি অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে লেন্দু মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। সবচেয়ে দুর্গম, উচুঁ পাহাড় ঘেরা, জঙ্গলাকীর্ণ এবং লোকালয় হতে সড়ক পথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি জায়গায় ব্যানব্যাটি-২কে ক্যাম্প স্থাপনের দায়িত্ব দেয়া হয়। আপত্তি সত্বেও ব্যানব্যাট-২ আকাশ, নৌপথে ও মাইলের পর মাইল পাঁয়ে হেটে কাফেতে ক্যাম্প স্থাপন করে।

২০০৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ক্যাপ্টেন শহীদ ২০ জনের একটি টহল দল নিয়ে আশে পাশের এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার ও মিলিশিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের উদ্দেশ্যে ক্যাম্প হতে বের হয়ে কয়েকটি বড় বড় পাহাড় পাড়ি দিয়ে এনদোকি নামক স্থানে পৌছান। হঠাৎ অসংখ্য মিলিশিয়া অতর্কিত হামলা চালায় এই ছোট টহল দলটির উপর । বাংলাদেশী বীর সৈনিকরা মাত্র এই কয়েকজন সদস্য নিয়ে বীর দর্পে মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। বুনিয়া এবং কাফে হতে সাহায্যকারী এ্যটাক হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে পৌছার পূর্বেই ৯ জন বাংলাদেশী শান্তিসেনার দেহ ছিন্নভিন্ন করে পালিয়ে যায় দুর্বিত্তরা।

ইতুরী সমস্যা কঙ্গোর অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। আশু সমাধানের লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়ে জড়ো করা হয় আরো বহু জাতিসংঘ বাহিনী, সাথে কঙ্গোর সেনাবাহিনী। শুরু হয় মিলিশিয়াদের উপর উপর্যুপরি হামলা। পরিস্থিতি রীতিমত যুদ্ধের আকার ধারণ করে। গুড়িয়ে দেয়া হয় একের পর এক মিলিশিয়াদের শক্ত ঘাঁটিগুলি। ফলে তাদের ভীত নড়ে যায়। বড় বড় মিলিশিয়া নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। অনেকে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। নিরস্ত্র করা হয় সমস্ত মিলিশিয়াদের। শান্তি এবং স্বস্তি ফিরে আসে ইতুরীসহ সমগ্র কঙ্গোতে।[৩২]

ইতিমধ্যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কঙ্গোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশের জীবন যাত্রা স্বাভাবিকের পথে ফিরে আসছে। কিন্তু সেই মাটিতে রয়ে গেছে ৯ বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের রক্ত। যার দাগ কোন দিন মুছে যাবে না শান্তিকামী মানুষের ইতিহাসের পাতা থেকে। এমনি করে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে নিজের দেহের ঘাম, রক্ত এবং জীবন উৎসর্গ করে দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

কঙ্গোতে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষক ও সৈন্যদের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো ঃ

Serial	Country	Military Observers	Troops	Total
১	আলজেরিয়া	১১	০	১১
২	বাংলাদেশ	২৩	১৩০২	১৩২৫
৩	বেলজিয়াম	৫	০	৫
৪	বেনিন	২৩	০	২৩
৫	বলিভিয়া	৭	২০২	২০৯
৬	বোসনিয়া	৫	০	৫
৭	বুরকিনো ফাসো	১২	০	১২
৮	ক্যামেরুন	৩	০	৩
৯	কানাডা	৭	০	৭
১০	চিলি	০	০	০
১১	চীন	১২	২১৮	২৩০
১২	চেক রিপাবলিক	৫	০	৫
১৩	ডেনমার্ক	২	০	২
১৪	মিশর	২৮	০	২৮
১৫	ফ্রান্স	৫	৩	৮
১৬	ঘানা	২৩	৪৬২	৪৮৫
১৭	ভারত	৪১	৩৩১	৩৭২
১৮	ইন্দোনেশিয়া	১২	১৭৫	১৮৭
১৯	আয়ারল্যান্ড	৩	০	৩
২০	জর্ডান	৩০	০	৩০
২১	কেনিয়া	৩৬	৬	৪২
২২	মালাবী	২৪	০	২৪
২৩	মালয়েশিয়া	২০	০	২০

Dhaka University Institutional Repository

২৪	মালি	২৮	০	২৮
২৫	মরক্কো	৪	৮০১	৮০৫
২৬	মঙ্গোলিয়া	২	০	২
২৭	মোজাম্বিক	২	০	২
২৮	নেপাল	২০	১২২৮	১২৪৪
২৯	নাইজার	১৬	০	১৬
৩০	নাইজেরিয়া	২৫	০	২৫
৩১	পাকিস্তান	৩৯	১০৫০	১০৮৯
৩২	প্যারাগুয়ে	২০	০	২০
৩৩	পেরু	৫	০	৫
৩৪	পোল্যান্ড	৩	০	৩
৩৫	রোমানিয়া	২৭	০	২৭
৩৬	রাশিয়া	২৯	০	২৯
৩৭	সেনেগাল	২২	৪৫৯	৪৮১
৩৮	লাইবেরিয়া	০	৬	৬
৩৯	দক্ষিণ আফ্রিকা	১৩	১৪৩৪	১৪৪৭
৪০	স্পেন	৩	০	৩
৪১	শ্রীলংকা	২	০	২
৪২	সুইডেন	৮	৮৬	৯৪
৪৩	সুইজারল্যান্ড	২	০	২
৪৪	তিউনিশিয়া	২৮	৪৬৫	৪৯৩
৪৫	যুক্তরাজ্য	৮	০	৮
৪৬	ইউক্রেন	১৫	০	১৫
৪৭	উরুগুয়ে	৫১	১৭৬১	১৮১২
৪৮	জাম্বিয়া	২২	০	২২
	মোট	৭৩১	৯৯৮৫	১০৭১৬

Dhaka University Institutional Repository

কঙ্গোতে নিয়োজিত বিভিন্ন দেশের পর্যবেক্ষক ও সৈন্যদের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।[৩৩]

কঙ্গোতে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর ১৪১৭ নং প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে MONUC (United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo) গঠন করে। পৃথিবীর মোট ৪৮টি দেশ পর্যবেক্ষক ও শান্তি রক্ষী বাহিনী দিয়ে এই মিশনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। এই মিশনে মোট ৭৩১ জন পর্যবেক্ষক, ৯৯৮৫ জন শান্তিরক্ষীসহ ১০৭১৬ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পর্যবেক্ষক ও শান্তি রক্ষী আসে উরুগুয়ে থেকে, যাদের সংখ্যা ১৮১২ জন। তার পরই হলো দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান, পর্যবেক্ষক ও শান্তিরক্ষী মিলিয়ে এদের সংখ্যা ১৪৪৭ জন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান হলো তৃতীয়। ২৩ জন পর্যবেক্ষক ও ১৩০২ জন শান্তিরক্ষীসহ মোট ১৩২৫ জন বাংলাদেশী এ মিশনে অবদান রাখে। [৩৪] সৈন্য সংখ্যাগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় হলেও কর্মদক্ষতায় বাংলাদেশীদের অবস্থান ছিল শীর্ষে। ইতুরীর মত বিপদ সংকুল জায়গায় যেখানে কোন দেশের সৈন্যরা কাজ করতে রাজী হয়নি, সেখানে বাংলাদেশী শান্তি রক্ষীরা জীবনের বিনিময়ে হলেও দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এসেছে। যা অন্য কোন দেশের শান্তিরক্ষীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৫.৭ মোজাম্বিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের ভূমিকা ঃ

ONUMOZ (United Nations Operation in Mozambique) বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী সফলতার আরেকটি গল্প। যা ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়।[৩৫] বাংলাদেশ ONUMOZ-এ ১৯৯৩ সালের এপ্রিল-এ যোগদান করে এবং এই মিশনের সমাপ্তি পর্যন্ত কার্য চালিয়ে যায়। এই মিশনের সমাপ্তি ঘটে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং গনতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে। এর ফলে মোজাম্বিকের ১৪ বৎসরের গৃহ যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই মিশনে বাংলাদেশের ১৩০০ র বেশী সৈন্য প্রথম ব্যাচে অংশ গ্রহন করে এবং জাতিসংঘের অধীনে মোজাম্বিকে শান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে।[৩৬] নিম্নে এই মিশনের কিছু পটভূমি তুলে ধরা হলোঃ

মোজাম্বিকের আদি অধিবাসীরা ছিল বুশম্যান (Bushmen) যাদেরকে Anoes বলা হতো। তারা ১০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এখানে আসে।[৩৭] তারপর আসে আরবরা এবং তারা মোজাম্বিকের উত্তর পূর্ব উপকূলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। আরবরা চীন, ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করে। তারা মূলত মূল্যবান ধাতু, চামড়া, স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর এর ব্যবসা করত। ব্যবসা

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে সমৃদ্ধ করে এবং তারা সমস্ত দেশে প্রধান্য বিস্তার করতে শুরু করে। ১০ থেকে ১৪ শতকের মধ্যে এখানে রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বহাল ছিল।[৩৮]

১৫০৮ সালে পর্তুগীজরা মোজাম্বিকের সুলতানকে পরাজিত করে উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে। উপনিবেশিক শাসন আমলে দাস ব্যবসা বিস্তার লাভ করে এবং বলা হয় ১৮২০ সালে ৩০,০০০ দাসকে উপসাগরীয় এলাকায় স্থানান্তরিত করা হয়।[৩৯]

পর্তুগীজ শাসনের প্রথমে ইহা ছিল কোম্পানী শাসনাধীন। ১৮ শতকে ইহা পর্তুগালের সরাসরি শাসনে আসে। ১৯৩০ সালে মোজাম্বিককে সীমিত স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে পর্তুগাল মোজাম্বিককে পর্তুগালের একটি উপসাগরীয় বৈদেশিক প্রদেশে রুপান্তরিত করে। পর্তুগালের এই ব্যবস্থা মোজাম্বিকবাসীকে সন্তুষ্ট করে নাই।

বিশ্বে তখন জাতীয়তাবাদের জয়যাত্রা চলছিল। ১৯৬২ সালের ২৫শে জুন জাতীয়তাবাদীরা FRELIMO (Frente de Libertacao de Mozambique) র সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডঃ এডওয়ার্ডো মন্ডালিন এর নেতৃত্বে পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক লড়াই শুরু করে। পর্তুগালের ৭০ হাজার সৈন্য ও এই বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হয়নি। পর্তুগাল পরাজিত হয় এবং ১৯৭৫ সালের ২৪শে জুন মোজাম্বিক স্বাধীনতা লাভ করে।[৪০]

এই স্বাধীনতা মোজাম্বিকে শান্তি আনয়ন করেনি। এক রকমের সংঘাত অন্য রকমে রুপান্তরিত হয়। যা হলো বর্তমানের অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক সংঘাত। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা তারা দ্রুত ভুলে গেলো পৃথক পৃথক হয়ে গেলো এলিট ও বর্নবাদীরা। অনেক বিদ্রোহী গ্রুপের জন্ম হলো এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষ শুরু হলো।

১৯৭৬ সালে RENAMO বা MNR (Movimento Nacional da Resistancia de Mozambique) নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্চ ১৯৭৬ সালে মোজাম্বিক রোডেশিয়ার সাথে তার সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। রোডেশিয়া RENAMO কে সক্রিয় সমর্থন দিতে শুরু করে। রোডেশিয়া সরকার RENAMO গেরিলাদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে। অবশ্য তারপূর্বে ১৯৭৫ সালের জুনেই প্রেসিডেন্ট সামোরা মিশেল মোজাম্বিককে এক দলীয় রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষনা করেছিল।[৪১]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০ সালে রোডেশিয়া শ্বেতাঙ্গ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে জিম্বাবু নাম ধারণ করে। নতুন সরকার RENAMO-র প্রতি সব রকম সমর্থন বন্ধ করে দেয়। ১৯৮১ সালে RENAMO বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলতে শুরু করে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ANC র সমর্থন পায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সক্রিয় সমর্থন পেয়ে RENAMO একাধারে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধ বন্ধের কোন পথ না পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মোজাম্বিক ১৯৮৪ সালে অনাগ্রাসন চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু এই চুক্তি স্থায়ী হয়নি।[৪২]

১৯৮৭ সালে মোজাম্বিক এবং জিম্বাবুয়ে Beira Corridor এর নিরাপত্তার ব্যাপারে এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। মোজাম্বিক মালাবীর সাথে Nacala Corridor এর ব্যাপারে আরো একটা চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু কোনটাই কার্যকরী হতে পারে নাই।

১৯৮৯ সালে RENAMO এক পক্ষীয়ভাবে যুদ্ধবিরতির ঘোষনা দেয়। FRELIMO সরকার RENAMO কে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আলোচনার প্রস্তাব দেয়। এটাই ছিল সরকারের পক্ষ থেকে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ। কয়েকমাস পর RENAMO সরকারের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিম্নলিখিত দাবীনামা গুলো উত্থাপন করেঃ

(ক) রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি দেয়া,

(খ) বহুদলীয় পদ্ধতির সূচনা করা, এবং

(গ) মোজাম্বিক হতে পূর্নভাবে জিম্বাবুয়ের সৈন্য প্রত্যাহার করা ।[৪৩]

শর্ত তিনটি পূরণ করার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি থাকা সত্বেও FRELIMO সরকার সময় ক্ষেপন করতে থাকে। ফলে RENAMO ভবিষ্যৎ আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৯০ সালের ৮ হতে ১০ জুলাই রোমে সরকার ও RENAMO প্রতিনিধিদের মধ্যে আবার শান্তি আলোচনা শুরু হয়। এই বৈঠকে General Peace Agreement (GPA) Protocol স্বাক্ষরিত হয়। যা দিল নিম্নরূপঃ

(ক) সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ করা,

(খ) সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহন করা,

(গ) GPA-র কার্যকারিতা এবং যুদ্ধবিরতি তদারক, পর্যবেক্ষন ও মনিটর করার জন্য জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন,

(ঘ) সামরিক কার্যকলাপ হতে উভয় দলের বিরতি,

(ঙ) সকল বিদেশী সৈন্যের প্রত্যাহার, এবং

Dhaka University Institutional Repository

(চ) RENAMO এবং FRELIMO উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী গঠন।[৪৪]

দীর্ঘদিনের সংঘাত নিরসনের জন্য দুপক্ষই প্রথম বারের মতো এই প্রস্তাব অনুকূল পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহন করে নেয়। কিন্তু ইহার বাস্তবায়ন খুব সহজ হয়নি। এই পদ্ধতির বিপক্ষে বহু অভিযোগ ছিল। নভেম্বর ১৯৯১ সালে আর একটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যার ফলে RENAMO রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ৪ অক্টোবর ১৯৯২ সালে মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্ট ও RENAMO-র প্রেসিডেন্টের মধ্যে GPA স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ১৫ অক্টোবর ১৯৯২ সাল হতে ইহা কার্যকর হয়।[৪৫] দুই দল সমন্বিত ভাবে প্রস্তাব পাশ করে। দুই পার্টিই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অস্ত্র বিরতি, যুদ্ধবিরতি এবং নির্বাচন পদ্ধতি পর্যবেক্ষনের ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌছে। ৯ অক্টোবর ১৯৯২ সালে জাতিসংঘ মহাসচিব ব্রুট্রোস-ব্রুট্রোস ঘালি UNSC তে মোজাম্বিকে জাতিসংঘের ভূমিকা সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। তার সুপারিশ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৯২ সালের ১৩ ই অক্টোবর ৭৮২(১৯৯২) নং রেজুলেশন অনুযায়ী ২৫ জন সামরিক পর্যবেক্ষক তাৎক্ষনিকভাবে পাঠানোর জন্য অনুমোদন করেন।[৪৬]

ইহার ফলে মোজাম্বিকে ১৪ বৎসরের গৃহযুদ্ধের ফলপ্রসু সমাপ্তি ঘটে। যাতে ৬ লক্ষ লোক মারা যায় এবং ৬ মিলিয়ন বা ৬০ লক্ষ লোক উদ্বাস্ত হয়। যাদের মধ্যে ৪-৪.৫ মিলিয়ন নিজেদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।[৪৭] দেশের অর্থনীতি, অবকাঠামো এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা নষ্ট হয়।

ONUMOZ এর ফোর্স কমান্ডার নিযুক্ত হয়েছিলেন একজন বাংলাদেশী জেনারেল। জেনারেল আবদুস সালাম। তিনি সমগ্র মোজাম্বিককে দক্ষিন, মধ্য ও উত্তর এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে শান্তি রক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন।[৪৮] তিনি মোজাম্বিকের নিকট প্রতিবেশী মালাবী ও জিম্বাবুয়ের সাথে করিডোরগুলো রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা করেন। কারন মোজাম্বিকের স্থল বাণিজ্য অনেকটাই এই করিডোরগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ও এই করিডোরগুলোর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ফোর্স কমান্ডার এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সফল হন।

বাংলাদেশী সৈন্যদের দায়িত্ব পড়ে উত্তরাংশে। ২৫টি দেশের শান্তিরক্ষীদের মধ্যে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষীদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বাংলাদেশের একটি পদাতিক ইউনিট, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী, একটি মেডিকেল ইউনিট, একটি লজিষ্টিক কোম্পানী ও একটি যোগাযোগ

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপনকারী ইউনিট মোতায়েন ছিল এবং তারা নিরলস ভাবে তাদের উপরর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রবিরতি, যুদ্ধবিরতি এবং নির্বাচন পদ্ধতি পর্যবেক্ষন ছাড়াও বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা মানবিক কাজ সম্পন্ন করেছে। উদ্বাস্তদের পূর্নবাসন, রিলিফ বন্টন, স্বাস্থ্য সেবাসহ সর্বপ্রকারের মানবিক কার্য সম্পাদন করে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা অপূর্ব এবং স্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

এই অভিযানে বাংলাদেশের ১৩০০-র বেশী সৈন্য প্রথম ব্যাচে অংশ গ্রহন করে এবং মোট ২৩২১ জন সৈন্য অংশ গ্রহন করেছে।[৪৯] জাতিসংঘের অধীনে মোজাম্বিকে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যা মোজাম্বিক এবং জাতিসংঘের ইতিহাসে উজ্জল হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীসহ আন্তর্জাতিক সমর্থনে সেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন শেষে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদেশের গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতা গ্রহন করেছে। তাদের পুলিশ ও মিলিটারীকে প্রশিক্ষণ দান করেছে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা।

৫.৮ সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী

জুন ১৯৯৮ সালে নিরাপত্তা পরিষদ সিয়েরা লিওনের শান্তি প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে UNOMSIL (United Nations Observer Mission in Sierra Leone) প্রতিষ্ঠা করে। জাতিসংঘের মুখপাত্র ওকোলো এই মিশন প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান। এই মিশনের মূল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় দেশদ্রোহী সামরিক দলগুলোকে আত্মসমর্পণে উদ্দীপ্ত করত দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সংগঠন সুসংহত করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা। প্রথমত বিভিন্ন দেশের মোট ৭০ জন সামরিক পর্যবেক্ষক হেস্টিংস, বো এবং ম্যাকেনিতে মোতায়েন করা হয়। নিরস্ত্র সামরিক পর্যবেক্ষক এবং ECOMOG (Economic Monitoring Group of West Africa) সৈন্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসীদের নিরস্ত্রীকরণের কাজে যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করে।[৫০]

লোমে শান্তিচুক্তি ঃ ০৭ জুলাই ১৯৯৯ সিয়েরা লিওনের পার্শ্ববর্তী দেশ তোগো এর রাজধানী লোমে কাব্বাহ সরকার এবং বিবদমান দেশদ্রোহী সন্ত্রাসী দলগুলোর মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক লোমে

Dhaka University Institutional Repository

শান্তি চুক্তি। মূলত এ চুক্তির মাধ্যমেই সিয়েরা লিওরেন তাতানো মাটিতে শান্তির প্রচ্ছন্ন বীজ রোপিত হয়। এ শান্তিচুক্তির লক্ষ্য ছিল বিগত ৮ বছর ধরে চলমান গৃহযুদ্ধের অবসান এবং জাতীয় ঐক্যমত্যের সরকার গঠন। এ চুক্তি UNOMSIL এর কার্যকলাপকে আরো বিকশিত ও শক্তিশালী করার সুপারিশ করে। ২০ আগস্ট ১৯৯৯ এ সামরিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ২১০ এ উন্নীত করা হয়।[৫১]

UNOMSIL থেকে UNAMSIL

অক্টোবর ১৯৯৯-এ জাতিসংঘ রেজুলেশন ১২৭০ এর মাধ্যমে শান্তি অন্বেষার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আরো বর্ধিত কলেবরে কাজ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ UNOMSIL স্থগিত করে নতুন মিশন হিসেবে UNAMSIL (United Nations Assistance Mission in Sierra Leone) প্রতিষ্ঠা করে যার মাধ্যমে ৬০০০ সশস্ত্র সৈন্য এবং ২৬০ জন সামরিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ শক্তিশালী মিশনের মূল লক্ষ্য লোম চুক্তির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৯-এ নাইজেরীয় কূটনীতিক জনাব ওলুয়েমি আদেনিজি এই মিশনের প্রধান এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দুত হিসেবে নিয়োগ পান।

০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ নিরাপত্তা পরিষদ রেজুলেশন ১২৮৯ এর মাধ্যমে UNAMSIL-এর ম্যানডেটকে পরিমার্জন করে ম্যানডেটের কার্যাবলীকে আরো বিস্তৃত করে এবং সামরিক শক্তি ১১,১০০ তে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। জনসংযোগ, বেসামরিক পুলিশ, প্রশাসনিক এবং কারিগরি সদস্য নিয়োগের ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯মে ২০০০ এ রেজুলেশন ১২৯৯ এর মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদ ২৬০ জন পর্যবেক্ষক সহ সামরিক সদস্য সংখ্যা ১৩,০০০ এ উন্নীত করতে ঐক্যমত্যে উপনীত হয়।[৫২]

সিয়েরা লিয়ন ও সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও বর্ণনা ঃ

১৪৬২ সালে প্রথম পর্তুগীজ পরিব্রাজক পেদ্রো দ্য সিন্ট্রা পশ্চিম আফ্রিকার এ সুন্দর দেশটি দেখে নাম দেন সেরা লয়া যার অর্থ হলো সিংহ পর্বতমালা। পরবর্তীতে দেশটির নাম সিয়েরা লিয়ন হিসেবে পরিচিতি পায়। হাজার বছর ধরে ঘটনাচক্রে বহিরাগত বিভিন্ন আফ্রিকান উপজাতি দ্বারা দেশটিতে মিশ্র জনপদ গড়ে উঠে। এখানে ভাষা বৈষম্য ও স্পষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

সিয়েরা লিয়ন ছিল একটি বৃটিশ উপনিবেশ। হীরা, টাইটানিয়াম, বক্সাইট, সোনা এবং ক্রোমাইটের মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দেশটি ২৭ এপ্রিল ১৯৬১ সালে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ করে।

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ শান্তিময় এ দেশটিতে ১৯৯১ সাল থেকে সংঘাত শুরু হয়। লাইবেরিয়ায় একনায়ক চার্লস টেলর এর মদদপুষ্ট RUF বা রেভ্যুলুশনারি ইউনাইটেড ফ্রন্ট প্রথম সরকারের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার উৎখাতের যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৯২ এবং ১৯৯৬ সালের সামরিক ক্যু, ১৯৯৬ সালের বহুদলীয় নির্বাচন এবং ১৯৯৭ সালে পুনরায় ক্যু এর ফলে দেশটির অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ও ভয়াবহ হয়ে উঠে। শান্তির পরিবর্তে সিয়েরা লিয়ন হয়ে উঠে এক হত্যা ও ধ্বংসপুরী।[৫৩]

এই ধ্বংস, হত্যা এবং মৃত্যুর মধ্যেই স্বাক্ষরিত হয় লোম শান্তি চুক্তি। যার পরবর্তীতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীরা মৃত্যুপূরীতে শান্তির পতাকা পুনরায় উড়াতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সিয়েরা লিয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী এবং বাংলাদেশ ঃ

জাতিসংঘের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তড়িৎগতিতে স্বভাবসুলভ পেশাদারিত্ব নিয়ে সাজসরঞ্জামে সজ্জিত হয় ব্যানব্যাট-১ । বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যানব্যাট-১ কে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আধুনিক অস্ত্র এবং যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত করে । অবশেষে আশা-আকাংখার অনেক দোদুল্যমান প্রহর পেরিয়ে ব্যানব্যাট-১ এর অগ্রগামী দল ২৯ মে ২০০০ এবং শেষ দল ১৭ জুন ২০০০ তারিখে সিয়েরা লিয়নের মাটিতে পা রাখে ।[৫৪]

মার্চ ২০০২ পর্যন্ত সিয়েরা লিয়নে পর্যবেক্ষক ও স্টাফ অফিসারসহ মোট ৪২৭৪ জন বাংলাদেশী শান্তি রক্ষী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত হয় ।[৫৫]

সেখানে বাংলাদেশের একটি সেক্টর, তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটি আর্টিলারী ব্যাটালিয়ন, একটি সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, একটি লজিস্টিক ব্যাটালিয়ন এবং একটি মেডিক্যাল ইউনিট শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর কাজ করে যায়। UNOMSIL সদর দপ্তর ২০০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ হতে একটি দক্ষ সিগন্যাল কন্টিনজেন্ট আহ্বান করে । এটাই ছিল শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকালে প্রথমবারের মত পূর্ণাঙ্গ একটি সিগন্যাল কন্টিনজেন্টের অংশগ্রহণ । জাতিসংঘের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ মিশনে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে গঠন করা হয় বাংলাদেশ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন-১, যা সংক্ষেপে ব্যানসিগ-১ নামে অধিক পরিচিত । পরে এর স্থলাভিষিক্ত হয় ব্যানসিগ-২ ।[৫৬]

অপারেশনাল দায়িত্বে ব্যানসিগ ঃ

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগাযোগ প্রদানের মত অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন-১ (ব্যানসিগ-১) ২০০১ সালের মার্চ মাসে ৬৯৯ জন সদস্য নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করে । নিঃসন্দেহে ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির যুগে এই দায়িত্ব ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ । সিগন্যাল কোরের ইতিহাসে ব্যানসিগ-১ এর এই সাহসী পদক্ষেপ একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে ।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

সিয়েরালিয়নের সর্বত্র ব্যানসিগ

ইউনামসিলের সকল কর্মতৎপরতা ৫টি সেক্টরে বিন্যস্ত। এই ৫টি সেক্টরে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদানের নিমিত্তে ৫টি কোম্পানী নিয়ে সিগন্যাল কোরের মূল কাঠামো তৈর করা হয়। যা সিয়েরা লিয়নের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রত্যেকটি ব্যাটালিয়নে সিগন্যাল কোরের সদস্যরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে। বিভিন্ন ভাষা ভাষীদের সাথে তারা অনায়াসে কাজ করেছে কোন রকম সাহায্য ছাড়াই।

বিভিন্ন সেক্টরে যোগাযোগ প্রদান ছাড়াও ইউনামসিল সদর দপ্তরে যোগাযোগ প্রদানের নিমিত্তে গঠন করা হয় ফোর্স হেডকোয়ার্টার ব্যানসিগ কোম্পানী। যা সদর দপ্তরের অভ্যন্তরীন সকল যোগাযোগ ছাড়াও প্রতিটি সেক্টর সদর দপ্তরের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ নিশ্চিত করে চলেছে। তারা সিগন্যাল সরঞ্জামাদি মেরামত, পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ইউনামসিলে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। বিদেশী ব্যাটালিয়নগুলোর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়ার যে দৃষ্টান্ত সিগন্যাল কোরের সেনা সদস্যরা স্থাপন করেছে, তা নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব।[৫৮]

মানবতার সেবায় ব্যানসিগ

সিয়েরা লিয়ন পুনর্গঠনে ব্যানসিগ-১ এর অবদান ছিল দৃষ্টান্তমূলক। গডরিচ এলাকায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর স্থাপন করার সাথে সাথেই সেখানে নির্মাণ করা হয় লেবেল-১ হাসপাতাল। যার লক্ষ্য ছিল সেনা সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। কিন্তু পরে লেবেল-১ হাসপাতাল সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা প্রদান শুরু করে। প্রথমে যুদ্ধাহত ও পরে সবধরণের রোগীই আসতে শুরু করে। সপ্তাহে ২ দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ছাড়াও দরিদ্র রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করে মানবতার এক অসাধারণ নজির স্থাপন করে।

ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর সম্পূর্ণ নিজস্ব খরচে 'আধুনকিয়া চ্যারিটি স্কুল ও মসজিদ' পুনর্গঠন করে। (সেখানে ৮০/৯০ জন ছাত্রকে সপ্তাহে ৪ দিন বিনামূল্যে ধর্মীয় ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

পোর্ট লোকোতে সেক্টর-১ প্রায় ৭০ জন অনাথ শিশুকে নিয়ে Bangla-Sierra Friendship School তৈরীর মাধ্যমে এই কোম্পানী মানব সেবার যাত্রা শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ মার্চ ২০০২ তারিখে সিয়েরা লিয়নের রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব ডঃ আহমেদ তেজান কাবা এ অত্যাধুনিক স্কুলের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়াও AL-AGSA MOSQUE নির্মাণ করে স্থানীয় মুসলমানদের বহুদিনের স্বপ্ন পূরণ করেন।

কেনেসাতে সেক্টর-৩ 'শান্তিকুঞ্জ মসজিদ নির্মাণ করেছে, যেখানে একসাথে প্রায় ৩০০ লোক নামাজ আদায় করতে পারে। এ ছাড়াও বাংলা সিয়েরা ভলিবল গ্রাউন্ড ও বাংলা সিয়েরা ফুটবল গাউন্ড তৈরী করেছে।

দেশ গঠনের এইসব কর্মকান্ড দেখে আর ইউ এফ এর জনৈক বিদ্রোহী সদস্য অস্ত্র সমর্পনের পর বলেছিল "Bangladesh Contingents are the Ambassador of peace in Sierra Leone".[৫৯]

ছকের মাধ্যমে সিয়েরা লিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যানসিগের সেনাদলের অবস্থান

সিগন্যাল কোম্পানী	এলাকা	ইউনিট	সিগন্যাল সেনাদল
কোর্স হেডকোয়ার্টার কোম্পানী	ফ্রি টাউন লুঙ্গি লুঙ্গি	রাশিয়া এভিয়েশন ইউনিট ইউক্রেইন এভিয়েশন ইউনিট গার্ড এন্ড এ্যাডমিন কোম্পানী, কেনিয়া	কমসেন প্লাটুন সেকশন মাইনাস সেকশন মাইনাস
সেক্টর-১ ব্যানসিগ কোম্পানী	পোর্ট লোকো পোর্ট লোকো লুনসার লুঙ্গি	সেক্টর সদর দপ্তর, ১নং সেক্টর (নাইজেরিয়া) নাইজেরিয়ান ব্যাটালিয়ন ৮ বাংলাদেশ আর্টিলারি-১ বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন-৪	সেক্টর সাপোর্ট প্লাটুন ১নং প্লাটুন, সেক্টর ২নং প্লাটুন, সেক্টর ৩নং প্লাটুন, সেক্টর
সেক্টর-২ ব্যানসিগ কোম্পানী	সোলার হোটেল ফ্রি টাউন স্পার রোড, ফ্রি টাউন পডরিচ মাসিয়াকা	সেক্টর সদর দপ্তর, ২ নং সেক্টর (কেনিয়া) নাইজেরিয়ান ব্যাটালিয়ন-১০ নাইজেরিয়ান ব্যাটালিয়ন-৯ কেনিয়ান ব্যাটালিয়ন-৭	সেক্টর সাপোর্ট প্লাটুন ১নং প্লাটুন ২নং প্লাটুন ৩নং প্লাটুন
সেক্টর-৩ ব্যানসিগ কোম্পানী	ক্যানামা বো	সেক্টর সদর দপ্তর, ৩নং সেক্টর (ঘানা) গিনি ব্যাটালিয়ন নেপালিয়ান ব্যাটালিয়ন-১	সেক্টর সাপোর্ট প্লাটুন ১নং প্লাটুন, সেক্টর

	সোয়াম্বা টংগ ক্যানামা	জাম্বিয়া ব্যাটালিয়ন-৫ ঘানা ব্যাটালিয়ন-৪	২নং প্লাটুন, সেক্টর ৩নং প্লাটুন, সেক্টর ৪নং প্লাটুন, সেক্টর
সেক্টর-৪ ব্যানসিগ কোম্পানী	মাগবুরাকা মাগবুরাকা ম্যাকেনি কাবালা	সেক্টর সদর দপ্তর, ৪ নং সেক্টর(বাংলাদেশ) বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন-৩ নাইজেরিয়ান ব্যাটালিয়ন-৭ বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন-৫	সেক্টর সাপোর্ট প্লাটুন ১নং প্লাটুন, সেক্টর ২নং প্লাটুন, সেক্টর ৩নং প্লাটুন, সেক্টর
সেক্টর-৫ ব্যানসিগ কোম্পানী সদর দপ্তর, বাংলাদেশ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন	লুনসার গভর্নমেন্ট	পদাতিক রোল	

ব্যানব্যাট মোতায়েন

বাংলাদেশী সৈন্যদের কর্মদক্ষতায় সিয়েরা লিয়নের তাবৎ মানুষের কাছে বাংলাদেশ একটি অনবদ্য এবং প্রিয় নাম হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠে। বাংলাদেশের যে কোন বহর রাস্তায় বের হলে রাস্তার দু'পার্শ্বের মানুষ এমন কি মায়ের কোলের আধোবোলের শিশুও হাত নেড়ে চিৎকার করে Bangladesh Wel-Come. Bangladesh No Problem বলে স্বাগত জানাতে থাকে। এ সকল কারণেই UNAMSIL সদর দপ্তরে নবাগত বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন যথেষ্ট সমীহ আদায় করে নেয়।

UNAMSIL ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল ভি কে জেটলি সিয়েরা লিয়নের সবচেয়ে নাজুক এবং সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ স্থান লুঙ্গি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং লুঙ্গি উপদ্বীপ এলাকার নিরাপত্তা বিধানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাটালিয়নকে বৃটিশ সৈন্যদের স্থলাভিষিক্ত করেন। এ সিদ্ধান্তে নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া এবং কেনিয়ার ব্যাটালিয়নগুলো মনঃক্ষুন্ন হলেও সর্বসম্মতিক্রমে ২৮জুন ২০০০ এর মধ্যেই ব্যানব্যাট-১ স্বমহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে বিমান বন্দর সহ সমগ্র লুঙ্গি উপদ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে মোট ১৬টি ক্যাম্পে মোতায়েন হয় এবং শুধু অপারেশন কার্যক্রমেই নয়, বিমান বন্দরের নিরাপত্তা বিধানসহ ভিআইপি আপ্যায়নে অতিথি পরায়ন বাংলাদেশ ব্যাটালিয়ন যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

ব্যানআর্টি-১ এর সাফল্য

বাংলাদেশ সেনাসদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণের প্রাথমিক অর্জন হচ্ছে- এতে প্রতিদিনই বাংলাদেশ সরকার প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এছাড়া সেনাসদস্যরা নিজেদের ব্যবহারে যে সকল যান-বাহন, অস্ত্র-সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র নিয়ে এসেছে, তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে বাংলাদেশ সরকার পাচ্ছে জাতিসংঘের নিকট থেকে মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা। আর্টিলারির কামান, যা ব্যবহারের উপায় ও নেই, আশংকাও নেই। তা থেকেও পাচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। অর্থাৎ কোনরকম ব্যবহার বা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সাদা কামানের বিপরীতে আর্থিক লাভ হচ্ছে। তাই অর্ধেকের মত জনবল নিয়েও একটি গোলন্দাজ ইউনিট অনেক বেশী আর্থিক লাভ এনে দিচ্ছে। বলা যায় এক্ষেত্রেও ব্যান আর্টি-১ এর সাফল্য উল্লেখযোগ্য।

সবশেষে বলা যায়, গত ১০ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর সিয়েরালিয়নে আজ শান্তির বাতাস বইতে শুরু করেছে। এ পরিবর্তন রাতারাতি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে বাংলাদেশ সহ বহুজাতিক সেনাদলের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতা। ২০,০০০ শান্তি রক্ষীর মধ্যে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। আর শান্তির অন্বেষনে বাংলাদেশের সেনাদলের ভূমিকা ও সবচেয়ে বেশী। প্রায় সাড়ে নয় হাজার বাংলাদেশী সেনা সদস্যের ঘাম, মেধা ও সততা মিশে আছে সিয়েরা লিয়নের মাটিতে।

সময়ের হাত ধরে বাংলাদেশের একটি সেক্টর সদর দপ্তর, আরো দুটো যান্ত্রিক ব্যাটালিয়ন (BANBAT-2 BANBAT-3), BANENGR, BANARTY, BANSIG, BANLOG এবং একটি Level-II হাসপাতালের সমন্বয়ে প্রায় ৪২০০ গর্বিত বাংলাদেশী সৈনিক সিয়েরা লিয়নের শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় UNAMSIL এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে।[৬১]

শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অনেক সাফল্যের কাহিনী আছে। নিম্নে তার মধ্য থেকে সামান্য কিছু তুলে ধরা হলো। যা থেকে বাংলাদেশী সেনাদের বীরত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে।

২০০১ সালে সিয়েরা লিওনের গিনি সীমান্ত এলাকায় জাম্বুয়েমার নামক স্থানে বাংলাদেশী সেনারা অবস্থান নেয়। এলাকাটির শান্তিরক্ষার দায়িত্বে কমান্ডিং অফিসার ছিলেন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আলী হাসান। সেখানে RUF এবং CDF এর মধ্যকার সংঘর্ষ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ ছিল দুই গ্রুপের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে আনা। কিন্তু কিছুতেই তা

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব হচ্ছিল না। শেষে জেনারেল আলী হাসান অনুসন্ধানে জানতে পারলেন একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সংঘর্ষ হচ্ছে। গ্রামটির অবস্থান এমন এক জায়গায় যার চারপাশের অন্য গ্রামগুলিতে সিডিএফ এবং আর ইউ এফ এর ঘাটি। এই গ্রামে কোন গ্রুপেরই অবস্থান নেই। সুযোগ বুঝে তিনি এই গ্রামে দুগ্রুপকে আলোচনায় ডাকলেন। দীর্ঘ আলোচনার পরও কোন ফলাফল হলো না। ব্রি.জে. হাসান তখন একটা উপায় বের করলেন। তিনি উভয় পক্ষকেই প্রস্তাব করলেন কেউই এই গ্রামে অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। স্থানীয় জনগণও তার এই প্রস্তাব সমর্থন করলো। ফলে সশস্ত্র গ্রুপ দুটিও তা মেনে নিলো। স্থানীয় জনগণ ও সশস্ত্র গ্রুপ দুটি তখন প্রস্তাব করে গ্রামটির এমন একটি নামকরণ করা হোক, যাতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই ওখানে কেউ সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়।

স্থানীয়রা তখন মিঃ হাসানের নামে গ্রামটির নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু মিঃ হাসান তা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন গ্রুপ দুটির পক্ষ থেকে গ্রামটির নাম প্রস্তাব করা হয় বাংলাদেশ ভিলেজ। মিঃ হাসান প্রস্তাবটি মেনে নেন। জনগণও স্বত:স্ফূর্ততার সঙ্গে বাংলাদেশ ভিলেজকে স্বাগত জানায়, সেই থেকে আজ পর্যন্ত গ্রামটির নাম বাংলাদেশ ভিলেজ নামেই পরিচিত। শান্তিরক্ষীবাহিনীর সদস্যদের ব্যবহার, আচার-আচরণে সিয়েরা লিয়নের জনগণ এতটাই মুগ্ধ যে তারা নিজেদের গ্রামের নাম বাংলাদেশ করতে কোন রকম কুণ্ঠা বোধ করেনি। মজার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশ ভিলেজ হবার পর সেখানে আজ পর্যন্ত কোন সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। বাংলাদেশী বীরদের সিয়েরা লিওনে গৌরবময় অধ্যায়ের জন্যই বাংলাদেশ আজ সিয়েরা লিওনে অন্যতম জনপ্রিয় নাম।

২৪ মে ২০০১ মাকানির জঙ্গলে বিদ্রোহী গ্রুপ আর ইউ এফ এর সঙ্গে মিটিং করছে বাংলাদেশের অফিসার এবং মিটিংয়ের সভাপতিত্ব করছিলেন জাতিসংঘের দূত মিঃ শাস্ত্রী। তখনই খবর এলো সিডিএফ কোইডু এলাকা ঘিরে ফেলেছে। কোইডু হলো সিয়েরা লিওনের সবচেয়ে বড় ডায়মন্ড খনি এলাকা। কোইডুর দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশের সেনা অফিসার কর্নেল সাঈদ ও তার দুটি ইউনিট। RUF এর প্রধান কার্যালয় মাকানিতে। অবস্থা খুবই ভয়ানক। গুলি শুরু হলেই ক্রসফায়ারে মরবে কর্নেল সাঈদ সহ তার কোম্পানীর সৈন্যরা। মিটিং ফেলে কন্টিনজেন্ট কমান্ডার, ফোর্স কমান্ডার জেনারেল ওপান্ডেকে অনুরোধ করলেন তার অধীনে দুটো হেলিকপ্টার গানশিপ ও সঙ্গে দুটো Mi26 হেলিকপ্টার রেডী করতে। কমান্ডার তার গোলন্দাজ বাহিনীকে হেলিপ্যাডে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, সেই সঙ্গে নাইজেরিয়ান কমন্ডারকে অনুরোধ করলেন এক কোম্পানী সৈন্য দিতে। ইতিমধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। শেষ মুহূর্তে নাইজেরিয়ান কমান্ডার জানান, তার কোম্পানী কোইডুতে যাবার জন্য প্রস্তুত

Dhaka University Institutional Repository

নয়। অগত্য তিনি বাংলাদেশের মাইল ৯১ বাহিনীকে রেডি হতে বললেন। সব প্রস্তুতি শেষ করে তিনি বিকেল ৩টায় হেলিকপ্টারে উঠেন। সঙ্গে সৈন্য, অস্ত্র, গাড়ীসহ প্রয়োজনীয় সব কিছু। আধঘন্টা পর তিনি কোইডুতে নামেন।

কোইডু গভীর জঙ্গলে ঘেরা। সেখানে সিডিএফ এর প্রভাব বেশী। কর্নেল সাঈদের বাহিনীকে দেখে তারা বিশ্বাসই করতে পারেনি যে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা পৌছাতে পারে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর হেলিকপ্টার গানশিপ আর বিশাল কার্গো হেলিকপ্টার দেখে তারা গোলাগুলি বন্ধ করে দেয়। তারা বুঝতে পারে শান্তিরক্ষীদের সাথে তারা কুলিয়ে উঠতে পারবে না। তাই পরদিন আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত নেয়। আত্মসমর্পনের পর সিডিএফ এর সদস্যরা অস্ত্র জমা দেয়। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আলী হাসান এবং কর্নেল সাঈদ অস্ত্রগুলোকে গোপনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। এর ফলে পুরো সিয়েরা লিয়নের চিত্রই বদলে যায়। এর পরপরই আরইউএফ এর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পন শুরু করে।

বাংলাদেশী সৈনিকদের বুদ্ধিমত্তা আর সাহসের কারণেই CDF প্রথম সিয়েরালিওনে অস্ত্র সমর্পন করে। পুর্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় মনে করতো অস্ত্র সমর্পন সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেটা করিয়ে দেখায়। ২০০১ এর আগস্টের মধ্যে CDF এবং RUF এর দুই তৃতীয়াংশ অস্ত্র সমর্পন সম্ভব হয়। সিয়েরা লিওনের ইতিহাসের সাথে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নাম যুক্ত হয়।

দায়িত্ব শেষে দেশে ফেরার সময় সিয়েরা লিওনবাসী বাংলাদেশী সৈনিকদের জন্য অশ্রু ফেলে। এসবই বাংলাদেশী বীরদের কৃতিত্ব। যারা জাতিসংঘের আওতাধীন শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছে।[৬২]

৫.৯ জাতিসংঘ শান্তি মিশন ও বাংলাদেশ নৌ, বিমান ও পুলিশ বাহিনীঃ

জাতিসংঘ শান্তি মিশন ও বাংলাদেশ নামটি আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই ছুটে যাচ্ছে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। নিরলস প্রচেষ্টা এবং কর্মতৎপরতায় যথাযথ ভূমিকা রাখছে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকাই মুখ্য। তবে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌ, বিমান ও বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও অংশ গ্রহণ করে দেশ ও জাতির সুনাম ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে নৌ বাহিনীর ৬৪ জন অফিসার ও ১৯২ জন নাবিক বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের উজ্জল ভাবমূর্তি রক্ষায় সদা সচেষ্ট রয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর ৭৮ সদস্যের একটি নৌ কন্টিনজেন্ট ৬টি হাইস্পীড বোটসহ রিভারাইন ইউনিট হিসেবে এককভাবে সুদানে নিয়োজিত রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকান্ড এবং অবদান বহিঃ বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে।[৬৩]

সম্প্রতি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর অংশগ্রহণের পরিধি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অদ্যাবধি নৌ বাহিনীর সদস্যগণ ১০টি দেশে শান্তি রক্ষা মিশনে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে এবং বর্তমানে ১০টি দেশে নিয়োজিত রয়েছে।

দূর্যোগ মোকাবেলায় নৌ বাহিনীর পরিধি আজ দেশের গন্ডিপেরিয়ে বহিঃ বিশ্বের মাটিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। গত ২৬শে ডিসেম্বর (২০০৪) সুনামি পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে অংশ গ্রহনের জন্য নৌ বাহিনীর দুটি অফশোর পেট্রোল ভেসেল বানৌজ তুরাগ ও সাংগু বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী সহ যথাক্রমে শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে গমন করেছে।[৬৪] বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা বুকে ধরে যথাযথ দায়িত্ব পালন শেষে তারা আবার দেশে ফিরে এসেছে। সাথে করে নিয়ে এসেছে দুর্যোগ কবলিত মানুষের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সেনা ও নৌ বাহিনরি পাশাপাশি বিমান বাহিনীর ভূমিকা ও অতি উজ্জল। আমাদের পাবর্ত্য চট্রগ্রামের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে সেনাবাহিনী, বিডিআর ও অন্যান্য বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যুগপৎ শান্তি, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে আসছে। দেশের যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিমান বাহিনী আজ জনগণের বিশ্বস্ত বন্ধু। দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্মতৎপরতা ও ভূমিকা গর্ব করার মত।

১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহনের মাধ্যমে নিজের নাম অন্তর্ভূক্ত করে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ১৭টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহন করেছে। এর মধ্যে ১১টির কার্যক্রম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং ৬টির কার্যক্রম এখনো চলছে। কেবলমাত্র জনবল নয়, বিমান বাহিনী ১৯৯৫ সাল হতে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে ব্যবহারের জন্য হেলিকপ্টার সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে একটি এভিয়েশন

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিট এবং একটি এয়ার ফিল্ড সাপোর্ট ইউনিটসহ ২১০ জন বিমান বাহিনীর সদস্য পৃথিবীব্যাপী ০৬টি শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত রয়েছে।

দেশের পাশাপাশি দেশের বাইরেও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। ভারতের গুজরাটের ভয়াবহ ভূমিকম্প পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতায় অংশ গ্রহনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দুর্যোগ মোকাবেলায় আত্মপ্রকাশ ঘটে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর। এরই ধারাবাহিকতায় প্রলংকরী সুনামিতে বিধ্বস্ত শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে ত্রাণ তৎপরতায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর দুটি সি-১৩০ পরিবহন বিমান, দুটি বেল-২১২ হেলিকপ্টার এবং ২৮ জন সদস্যের একটি দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে। এছাড়া ২০০৫ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি সি-১৩০ পরিবহন বিমান ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে পাকিস্তানে গমন করে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ গ্রহন করে।[৬৫] এভাবে দেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দুর্যোগ পরবর্তী ত্রাণ তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জল থেকে উজ্জলতর করে যাচ্ছে। ২০০২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর স্পেশাল ফোর্স, বিমান বাহিনীর সালে যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনার পাশাপাশি প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করেছে। ইতিপূর্বে পূর্ব তিমুরে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়া বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার কন্টিনজেন্টকে কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশে ও অসাধারণ পেশাগত দক্ষতা ও নৈপূন্য প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ জাতিসংঘ মহাসচিবের Certificate of Excellence প্রদান করেছে।[৬৬]

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শুধু বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীই অংশগ্রহন করেনি। তাদের পাশাপাশি বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ও অংশ গ্রহণ করে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা দিয়ে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সাথে সাথে বেসামরিক পুলিশ সদস্যরাও দেশ ও জাতির জন্য সুনাম ও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। এ পর্যন্ত বেসামরিক পুলিশ সদস্যরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ১৪টিতে অংশ গ্রহণ করেছে এবং তাদের মোট সদস্য সংখ্যা হলো ১৬২০ জন। বেসামরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের নিম্নলিখিত মিশনগুলোতে অংশগ্রহণ করেছে। মিশনগুলো হলোঃ UNTAG (নামিবিয়া), UNTAC (কম্বোডিয়া), UNPROFOR (সাবেক

Dhaka University Institutional Repository

যুগোশ্লাভিয়া), ONUMOZ (মোজাম্বিক), UNAMIR (রুয়ান্ডা), UNMIH (হাইতি), UNAVEM-III (এঙ্গোলা), UNTAES (পূর্বশ্লোভেনিয়া), UNMIBH (বসনিয়া), UNTAET/UNMISET (পূর্ব তিমুর), UNMIK (কসভো), UNAMSIL (সিয়েরা লিওন), UNMIL (লাইবেরিয়া) ও MINUCI (আইভরি কোষ্ট)।[৬৭]

৫.১০ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

প্রকৃতপক্ষে শান্তিরক্ষা হলো জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত অন্তবর্তীকালীন চুক্তি এবং ইহা মৌলিক সমস্যার কোন চূড়ান্ত সমাধান নয়। তাই শান্তিরক্ষাকারীগণ মানসিক শক্তি সৃষ্টি করে স্থায়ী শান্তির পথ প্রশস্ত করে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এখন পৃথিবীর যে কোন শান্তিরক্ষা কাজে অংশগ্রহনকারী দেশের জন্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এখন সর্বাধিক সৈন্য প্রদানকারী দেশ। মোট ৩১টি শান্তিরক্ষা মিশনে অংশ গ্রহন করে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এং প্রতি বছর দেশের জন্য ১৬০০ কোটি টাকা আয় করে যাচ্ছে। শুধু শান্তি রক্ষীদের বেতন ভাতা বাবদই আয় হচ্ছে না। সেনা সদস্যরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে সকল যানবাহন, অস্ত্র ও সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যায় তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নিকট থেকে মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করে। আর্টিলারির কামান, যা ব্যবহারের উপায় ও নেই, আশংকা ও নেই, তা থেকেও সরকার পায় বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা। অর্থাৎ কোন রকম ব্যবহার বা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সাদা কামানের বিপরীতে আর্থিক লাভ হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই অর্থ দেশের জন্য এক বিরাট উপার্জন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে আমাদের সৈনিকরা দেশের জন্য কুড়িয়ে এনেছে অনেক বিরল আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান। বাংলাদেশী সৈনিকরা আজ বিশ্বব্যাপী উচুঁ মানের ডিসিপ্লিন্ড সৈনিক হিসেবে পরিচিত। শান্তিরক্ষী হিসেবে কোন দেশে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় অন্য যে কোন দেশের সৈনিকদের তুলনায় বাংলাদেশী সৈনিকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সবচেয়ে কম।

শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের এই অবস্থান অতি সহজে অর্জিত হয়নি। আজকের এ অবস্থানে উত্তরনের পথে সেনা, নৌ, বিমান ও বেসামরিক পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, সততা ও দেশপ্রেমের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ৭৬ জন সেনা সদস্য ও অফিসার আত্মদান করেছে।[৬৮] তারা মূলত ট্রাফিক এক্সিডেন্ট, মাইন বিস্ফোরণ,

Dhaka University Institutional Repository

রকেট হামলা, মিশাইল এ্যাটাক, বিমান দূর্ঘটনা এবং ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছে। এ ছাড়া আহত হয়েছে আরো অনেকে। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা বিভিন্ন দেশে কাজ করতে গিয়ে অপরিসীম দক্ষতা ও সাহসিকতার পরিচয় দেয় এবং তারা কখনো অবস্থানকারী দেশের সরকার কিংবা জনগণের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়নি। এছাড়া বাংলাদেশী সৈন্যদের কোন গোত্র বা জাতিগত সমস্যা নেই। যার ফলে বাংলাদেশী সৈন্যরা যে কোন দেশ বা সমাজে কাজ করতে কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় না। বাংলাদেশ একটি উদার গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশ। ফলে এদেশের শান্তিরক্ষীদের মাঝে কোন প্রকার ধর্মীয় উন্মাদনা, গোড়ামী কিংবা বিদ্বেষ নেই। এই শান্তি মিশনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নূতন বন্ধু, নূতন অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য উৎসের নূতন দ্বার উন্মোচন করেছে।

এক্ষেত্রে পর্যায়কমে যখন এ দেশগুলোতে পূর্ণ শান্তি ফিরে আসবে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নিজেরা উন্নয়নের ধারায় ফিরে যাবে তখন বিপদকালীন পরীক্ষিত বন্ধু বাংলাদেশের কথা তারা অবশ্যই স্মরণ করবে। এই রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক আরো গভীর থেকে গভীরতর হবে। বাংলাদেশ এই দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানীসহ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শান্তি মিশন পরিচালনাকালীন অভিজ্ঞতা ও সুসম্পর্ক কাজে লাগাতে পারবে। জনশক্তি রফতানীর পাশাপাশি পোশাক শিল্প রপ্তানী সহ আই.টি. (Information Technology) বা কম্পিউটার প্রযুক্তি রফতানির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারবে বাংলাদেশ। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত বর্তমানে আইটি সেক্টর থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

এই নতুন দেশগুলোতে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সফলতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ আইটি সেক্টরেও আমাদের মেধা, দক্ষতাও প্রযুক্তি সফল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যদি তাই হয় তবে তা হবে আমাদের জন্য আরেক নূতন বিপ্লব। যা শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে কোন অংশে কম হবে না। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের হাত ধরে দেশে দেশে শান্তি স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে। শান্তিরক্ষার পাশাপাশি আমাদের জন্য সে দ্বারও উন্মোচিত হচ্ছে।

শান্তি মিশনে কাজ করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশী সৈন্যরা অসংখ্য মেডেল লাভ করেছে। গত বছর (২০০৬) ১৫ জন বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর হ্যামারশোল্ড পদক প্রদান করেছে। জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহনকালে যারা আত্মদান করে তাদের ত্যাগকে শ্রদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

জানাতে এই পদক প্রবর্তিত হয়। ২০০৬ সালে ১৫ জন বাংলাদেশী সহ ৪৬টি দেশের মোট ১২৪ জন শান্তিরক্ষী এ মরণোত্তর পদকে ভূষিত হয়েছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ৩১ সদস্য বিশিষ্ট শান্তি স্থাপন কমিশনের সদস্য হিসেবে অনুর্ভূক্ত করা হয়েছে। যা বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জল করেছে।[৬৯] গত ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এই কমিশন গঠন করা হয়। যার কাজ হবে কোন দেশে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম হতে শুরু করে যুদ্ধ পরবর্তী সময় পর্যন্ত জাতিসংঘের কার্যক্রম দেখাশুনা করা। এই কমিশনে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তি প্রসঙ্গে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ডঃ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী বলেছেন, এটি বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি। খুব শীঘ্রই এই কমিটি সিয়েরা লিওন ও বুরুন্ডিতে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে সেখানেও বাংলাদেশ ঐ দুই দেশে তার শান্তিরক্ষীদের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে জোরালো ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের সকলের বিশ্বাস। বাংলাদেশী সৈন্যরা দেশে দেশে শুধু শান্তি স্থাপনই করে না। তারা অবস্থানকারী দেশে অফিসিয়াল কাজের বাইরেও বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে থাকে। যার ফলে বাংলাদেশী সৈন্যরা অবস্থানকারী দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ মানুষ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, সিয়েরা লিওনের অনেকেই আজ বাংলা গান গাইতে পারে। সিয়েরালিওনের দ্বিতীয় রাষ্ট্র ভাষা হলো বাংলা। যা অবিশ্বাস্য হলেও আজ সত্য। ২০০৩ সালে সিয়েরা লিওনের মাননীয় রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব ডঃ আহমেদ তেজান কাব্বা বাংলাদেশ সফর করেন। তিনি আমাদের তৎকালীন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "সিয়েরা লিওনের জনগণ বাংলাদেশী সৈন্যদের শুধু স্বাগতই জানায়নি, তারা আপনার সৈন্যদেরকে সে দেশ ছেড়ে আসতে দিতে ও চায়নি।" তিনি আরো বলেছিলেন, "আমরা আপনাদের অবদান কখনোই ভুলব না।" তিনি বাংলাদেশী সৈন্যদের শুধু শান্তিরক্ষায় অসামান্য অবদানের জন্যই নয়, সিয়েরা লিওনের জনগণকে একটি দুঃস্বপ্নময় জাতিগত যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ঐক্যবদ্ধ করার জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি এ কথাও বলতে ভুলেননি যে, শান্তিরক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশী সৈন্যরা তাদের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও রাস্তা তৈরী করে দিয়েছে। তাঁর এই অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আমাদের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বব্যাপী শান্তিরক্ষার গতানুগতিক সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৮ সালে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে আজ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের আঙ্গিনায় এক মহীরুহতে পরিণত হয়েছে। আমাদের নীল শিরস্ত্রাণধারী সৈনিকরা অস্ত্রের বদলে সেবা ও ভালোবাসা দিয়ে দেশে দেশে মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে তাদের চমৎকার পেশাদারিত্ব, কর্তব্যবোধ ও দেশ প্রেমের চেতনা। শান্তিরক্ষীর গতানুগতিক তকমা ফেলে তারা বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে মহান মানবতার সৈনিক হিসেবে। তারা শুধু তাদের উপর অর্পিত শান্তি রক্ষার দায়িত্ব শেষ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে আর্ত মানবতার সেবায়, দেশে দেশে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের কল্যাণে। এর মাধ্যমে তারা দেশের জন্য কুড়িছে এনেছে দুর্লভ সম্মান, বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর গতানুগতিক নেতিবাচক ধারণা। বিশ্বের অনেক সংকটাপন্ন জনপদে বাংলাদেশ আজ একটি আস্থা, ভরসা ও বিশ্বাসের নাম। তবে এই অর্জন এসেছে অনেক মূল্যবান আত্মত্যাগের বিনিময়ে। শান্তিরক্ষার মহানব্রত পালন করতে গিয়ে আমরা হারিয়েছি ৭৬ জন বীর সৈনিককে।

৫.১১ বাংলাদেশ আফগানিস্তান ও ইরাক অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের কোয়ালিশন বাহিনীতে অংশগ্রহণ করেনি ঃ

বাংলাদেশ একটি শান্তি প্রিয় দেশ এবং জাতিসংঘ সনদের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল। যার ফলে বাংলাদেশ কখনো কোন আগ্রাসী বা পরাশক্তির ক্রীড়ানক হয়ে কাজ করে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী হিসেবে জাতিসংঘ সনদের আওতাধীন এবং জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কেবল শান্তির সৈনিক হিসেবেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে আসছে। যার ফলে এ পর্যন্ত ৩১ টি শান্তি রক্ষা মিশনে অংশ গ্রহন করলেও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আফগানিস্তান এবং ইরাক অভিযানে কোয়ালিশন বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করেনি।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে যায়। পেন্টাগনেও হামলা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এই হামলার জন্য আল-কায়দা নেটওয়ার্ককে দায়ী করে। আল কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেয়ার জন্য আফগানিস্তানের তৎকালীন তালেবান সরকারকে ও অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। আল কায়দা নেটওয়ার্ককে ধ্বংস এবং তালেবান সরকারকে শায়েস্তা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে কোয়ালিশন বাহিনী আফগানিস্তানে হামলা চালায়। এ হামলার ফলে ওসামা বিন লাদেন ধরা না পড়লেও আল কায়দা নেটওয়ার্ক অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং

Dhaka University Institutional Repository

তালেবান সরকার ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়। তালেবান বিদাইয়ের পর আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের মনোনীত হামিদ কারজাই সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের সমর্থন ও মদদে এখনো বহাল আছে। এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বহুজাতিক কোয়ালিশন বাহিনী অংশগ্রহন করলেও বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেনি। কারণ একটাই, এ অভিযানের পেছনে জাতিসংঘের কোন অনুমোদন বা ম্যান্ডেট ছিল না। জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ব্যতীত কোন অভিযানে অংশ গ্রহনের নজীর বাংলাদেশের নেই। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার্থে বা আহবানে কোন অভিযানে অংশ গ্রহন করে না; বাংলাদেশ অংশগ্রহন করে জাতিসংঘের ডাকে এবং জাতিসংঘের নির্দেশিত পথে । এছাড়া এ অভিযান কোন শান্তি রক্ষা মিশন ছিল না। এটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর সামরিক হামলা যা একটা স্বাধীন, সার্বভৌম জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের উপর পরিচালিত হয়েছিল।

অনুরুপভাবে, ইরাকের হাতে পরমানু, রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র আছে, এই অজুহাতে ২০০৩ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যুক্তরাজ্যসহ কোয়ালিশন বাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এই কোয়ালিশন বাহিনীতে ও বাংলাদেশ অংশগ্রহন করেনি। কারন এই হামলার পেছনেও জাতিসংঘের অনুমোদন কিংবা কোন প্রকার ম্যান্ডেট ছিল না। বরং জাতিসংঘ সহ প্রায় পুরো শান্তিকামী বিশ্বই এই হামলার বিরুদ্ধে ছিল। হামলার পূর্ব পর্যন্ত জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকরা বছরের পর বছর পরিদর্শন করেও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়নি। বাংলাদেশ ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের সাথে তাল মেলাতে পারেনি। কারন এই অভিযানের পশ্চাতে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কোন সমর্থন ছিল না। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ ছিল এই অভিযানের বিরুদ্ধে সোচ্চার। খোদ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনেই এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত ছিল প্রবল। বাংলাদেশ সহ শান্তিকামী মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এ যুদ্ধটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ব্যক্তিগত আক্রোসের ফল এবং মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদের উপর স্থায়ী দখল প্রতিষ্ঠা করা।

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনী ইরাকের দীর্ঘকাল ব্যাপী বাথ পার্টির নেতা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে সমগ্র ইরাক দখল করে। ক্ষমতায় বসায় তাদের তাবেদার সরকার। সমগ্র ইরাক জুড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ও যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কথিত মরনাস্ত্রের এক বিন্দু ও তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। এমনকি সাদ্দাম হোসেন সরকারের সাথে আল কায়দা নেটওয়ার্কের যোগসূত্রের কোন প্রমান ও তারা খুঁজে বের করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট বুশ বলতে বাধ্য হয় মারনাস্ত্র না থাকলেও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনই ছিল বিশ্বশান্তির জন্য বিপদজনক। সুতরাং তাকে

Dhaka University Institutional Repository

উৎখাত করে পৃথিবীকে তারা বিপদমুক্ত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই উক্তি যে মিথ্যার প্রলাপ ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ হয়ে গেছে। সাদ্দাম শাসনের অবসান ঘটেছে ২০০৩ সালেই এবং ২০০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রহসনের বিচারের নামে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের কথিত বিপদ থেকে পৃথিবী মুক্ত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের হাতে পৃথিবী এখন জিম্মি এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ গোটা পৃথিবী অধিক পরিমানে বিপদে নিপতিত। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের দখলকৃত ইরাকের দিকে চোখ রাখলেই সেই বিপদের প্রমান পাওয়া যায়। ইরাকে প্রতিদিনই মরছে শুধু মানুষ আর মানুষ । যাদের অধিকাংশই সাধারণ ইরাকী নারী, পুরুষ এবং নিস্পাপ শিশু। মার্কিনীরা ও মরছে, প্রতিদিনই তাদের কফিন যাচ্ছে নিজ দেশের মাটিতে। যুদ্ধের প্রথম আঘাতেই ইরাকের অধিকাংশ স্থাপনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কত হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি যে বিনষ্ট হয়েছে তার হিসাব করা কঠিন। কিন্তু ইরাকে শান্তি আসেনি। যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ইরাকী গণতন্ত্র ও কার্যকর হয়নি। উপরন্তু দেশটি এখন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর হামলা দেশটিকে দিনে দিনে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশটির শিয়া, সুন্নী এবং কুর্দীরা একে অপরের চরম শত্রু। যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার সরকার দেশটির ঐক্য সাধনে কার্যত ব্যর্থ। এতো ধ্বংস এবং হত্যাকান্ডের পরও ইরাকের মাটিতে এখন কোয়ালিশন সৈন্যদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। তারা এখন কার্যত সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যরাও এখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পথ খুঁজছে।

বাংলাদেশ শান্তি প্রিয় এবং জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইরাক অভিযান থেকে নিজেকে বিরত রেখে সে বার্তাটিই আবার বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিল। শান্তির প্রতি নিজের অঙ্গীকারের প্রতিফলন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলো। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পদক্ষেপ যে সঠিক ছিল সাদ্দাম পরবর্তী অশান্ত ইরাক এবং মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থাই তার প্রমান। বাংলাদেশ কোন আগ্রাসী বা বিবেক বর্জিত একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়। এটি কোন মুরুব্বী বা পরাশক্তির কথায়ও নড়ে চড়ে না। যার ফলে সমস্ত বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে, আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতিকে লঙ্ঘন করে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের মাটিতে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ব্যতীত নির্লজ্জ ও নগ্ন হামলায় শরীক হতে পারেনি।

ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিম দেশ ইরাকের সাথে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের রয়েছে বন্ধুত্বপূর্ন ও সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক। যার ফলে ভ্রাতৃপ্রতীম এই দেশটির ধ্বংস সাধনে বাংলাদেশ কোয়ালিশন বাহিনীর সাথে যোগ দেয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশের জনগণ ও কখনো এহেন হীন কাজকে ঠান্ডা মাথায় মেনে নিতো না। একমাত্র জাতিসংঘের নেতৃত্বে এবং তত্ত্বাবধানেই বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে সৈন্য

Dhaka University Institutional Repository

পাঠাতে বদ্ধ পরিকর। বাংলাদেশী সৈন্যরা বিদেশের মাটিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের অধীনে শান্তি র সৈনিক ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যার ফলে বর্তমান ইরাকের মাটিতে তাদের পদচারনা নেই।

৫.১২ বাংলাদেশ লেবাননে শান্তিরক্ষী পাঠায়নি

জাতিসংঘের ১৭০১ রেজুলেশন অনুযায়ী দক্ষিণ লেবাননে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ২০০০ সৈন্য পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসরাইল সরকারের বিরোধীতার কারনে বাংলাদেশ সেখানে সৈন্য পাঠায়নি।

গত ২০০৬ সালের ১২ জুলাই ২ জন ইসরাইলী সৈন্য লেবাননের মাটিতে ঢুকে পড়ায় হিজবুল্লাহ গেরিলারা তাদের বন্দি করে। এই দুই জন ইসরাইলী সৈন্যকে মুক্ত করার অজুহাতে ইসরাইল লেবাননের মাটিতে আগ্রাসন অভিযান শুরু করে। ইসরাইল একই সাথে স্থল, জল এবং আকাশ পথে হামলা চালায়। ৩৪ দিনের এই যুদ্ধে হিজবুল্লাহ গেরিলারা ও এক মরণপন অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। তারা ইসরাইলের দিকে হাজার হাজার রকেট ছুড়ে মারে। যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষতি হলেও ইসরাইলের চেয়ে লেবাননের ক্ষতির পরিমান অনেক বেশী। তবে ৩৪ দিনের এই যুদ্ধে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় মানবতার। এখানে মানবতার মৃত্যু ঘটে। ইসরাইলের বেপরোয়া বোমা বর্ষনে লেবানন ধবংস স্তুপে পরিণত হয়। এই যুদ্ধে ইসরাইলী হামলায় ১০৭১ জন লেবানীজ নারী, পুরুষ এবং শিশু নিহত হয়। ভিটা মাটি ছাড়া হয় প্রায় ৭ থেকে ৯ লাখ লেবানীজ। অন্যদিকে হিজবুল্লাহ গেরিলাদের পাল্টা হামলায় ১১৪ জন ইসরাইলী সৈন্য ও ৪৩ জন বেসামরিক ইসরাইলী নিহত হয় এবং প্রায় ৫ লক্ষাধিক ইসরাইলী নাগরিক ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ইসরাইলী হামলায় বাড়ী, ঘর, রাস্তা-ঘাট, পুল কালভার্ট বিধ্বস্ত হওয়ায় লেবাননের আর্থিক ক্ষতি হয় কমপক্ষে প্রায় আড়াই বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে হিজবুল্লাহ গেরিলাদের পাল্টা হামলায় ইসরাইলের ক্ষতির পরিমান প্রায় এক দশমিক এক বিলিয়ন ডলার।[৭০]

এই যুদ্ধের প্রথম থেকেই জাতিসংঘ যুদ্ধ বিরতির আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু মানবতা বিরোধী রাষ্ট্র ইসরাইলের একগুয়েমীর কারনে তা করতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়েছে। দেরীতে হলেও শান্তির জয় হয়েছে। উভয় পক্ষ রাজী হলে ১৪ আগষ্ট ০৬ হতে এই যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। এর ফলে হিজবুল্লাহ গেরিলারা

Dhaka University Institutional Repository

ইসরাইলে তাদের রকেট হামলা চালাবে না এবং ইসরাইল ও লেবাননে তাদের স্থল কিংবা বিমান হামলা চালনা হতে বিরত থাকে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব ১৭০১ গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের ফলে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়। মূলত উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করাই এই মিশনের মূল কাজ। বাংলাদেশের কাছে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাব এলে বাংলাদেশ প্রথমেই ২ হাজার শান্তিরক্ষী সৈন্য দক্ষিণ লেবাননে পাঠাতে সম্মত হয়।

বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই ইসরাইলের আগ্রাসী নীতির বিরোধীতা করে এসেছে। যার ফলে ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের কোন প্রকার কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এবং সম্পর্ক স্থাপনেও বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ অনাগ্রহী। অন্যদিকে প্যালেষ্টাইন ও লেবাননের প্রতি বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ সব সময়ই উদার ও সহানুভূতিশীল। প্যালেষ্টাইনী জনগণের ন্যায্য অধিকারের প্রতি বাংলাদেশ দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম প্যালেষ্টাইনের অকৃত্রিম সমর্থক। সব আন্তর্জাতিক ফোরামেই বাংলাদেশ প্যালেষ্টাইন ও লেবাননের জনগণের পাশে থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আসছে। সে কারনে ইসরাইল ১৭০১ রেজুলেশন অনুযায়ী দক্ষিণ লেবাননে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী প্রেরনের বিরোধিতা করে। ইসরাইলের এই বিরোধিতার কারনে বাংলাদেশ সেখানে কোন সৈন্য পাঠায়নি। যদি ইসরাইল বিরোধীতা না করত তবে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা দক্ষিণ লেবাননেও তাদের কর্তব্য দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা দেখিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। বাংলাদেশ এখানেও হতো শান্তির মডেল।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ তথ্যপঞ্জী

১। Ali Zearat T.A., Bangladesh in United Nations Peace Keeping Operations, BIISS paper-16, July 1998. Published by: Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS), Dhaka, Bangladesh, p-36.

২। স্কোয়াড্রন লীডার হক রফিউল মোঃ, পিএসসি, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা, বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০০৬ ইং, ২১ শে নভেম্বর ২০০৬, দৈনিক আমার দেশ, পৃ-১২।

৩। Ali Zearat, T.A. Ibid, p-36

৪। Ibid,p-37

৫। হোসেন তোফাজ্জল, জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল বইমেলা ২০০৭, পৃ-৫২৮।

৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২৯

৭। স্কোয়াডন লীডার, হক রাফিউল মোঃ, পি এস সি, বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা ঃ বিশেষ ক্রোড়পত্র; সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০০৬ ইং, ২১শে নভেম্বর ২০০৬ ইং,দৈনিক আমার দেশ, পৃঃ ১২।

৮। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলম জাহাঙ্গীর, পি এস সি, জনগণের ভালবাসায় ধন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০০৩, ২১শে নভেম্বর ২০০৩, দৈনিক মানবজমিন, পৃঃ ৪।

৯। "Somalia: Countering Terrorism in a Failed State", ICG (International Crisis Group) Africa Report No. 45, 23 May 2002, Nairobi/Brussels, available at wwwmafhoum.com/press 3/106 P3. pdf.

১০। স্কোয়াড্রন লীডার হক রাফিউল মোঃ, পি এস সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২

১১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২

১২। Basic Facts About the United Nations, Department of Public Information, United Nations, New York, 1992, p-61

১৩। "The Blue Helmets", A Review of United Nations, Peace-keeping, Third Edition, published by. the United Nations, Department of Public Information, New York, NY 10017, August-1996, p-43.

429860

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৪। Basic Facts About the United Nations, Ibid-P-61-62

১৫। দৈনিক ইত্তেফাক, ২০/৮/০৬ ইং, পৃঃ ২০।

১৬। Rahman, Habibur (Lieutenant Colonel)," Overseas Employment of Army contingents: Prospects and Implications" Mirpur papers, DSCSE. Mirpur, Dhaka, Issue No, 1, 1993, p-45.

১৭। http://www.ploughshares.ca/content/ACR/ACROO/ACROO-Iran.htm,downloaded on January 2 2002.

১৮। BD Smith,"United Nations Iran-Iraq Military Ovserver Group, in Durch ed, New York, p-238-240.

১৯। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত)ঃ আজকের জাতিসংঘ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা , আগষ্ট-১৯৯৫, পৃঃ ৪৯

২০। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৯,৫০

২১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২

২২। United Nations, The Blue Helmets, Ibid, p-329-330.

২৩। Ibid, p-330-331,

২৪। Bangladesh Army Webpage http:/www.bangladesharmy.info/inter/com:htm, visited on April 14, 2004.

২৫। হোসেন, সাখাওয়াত (ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবঃ) এই সময়ের ভাবনা, সাদ্দামের ফাঁসিঃ ইরাকের কফিনে শেষ পেরেক, দৈনিক নয়া দিগন্ত, তাং- ০৪/১/০৭, পৃঃ ৭

২৬। Basic Facts About the United Nations, Ibid, p-54.

২৭। রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত)ঃ আজকের জাতিসংঘ, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৫৩

২৮। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪

২৯। Prepared by a group of Military Officers, Defence Service Command and staff College, Mirpur, Dhaka, Bangladesh.

৩০। দৈনিক ইত্তেফাক, ০১/৪/০৬ ইং।

৩১। JG Merrils, International Dispute Settlement, 2nd edn, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1991, p-203.

Dhaka University Institutional Repository

৩২। আহসান, ফখরুল মোঃ, (লেঃ কর্নেল) পি এস সি, " নয় শহীদের বীর গাঁথা," বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০০৬, ২১ নভেম্বর ২০০৬, দৈনিক আমার দেশ, পৃঃ ১২।

৩৩। Retrieved from http:www.monuc.org/Contrib. Milit, aspx.long...enon 29 May 2004. The Statistics have been updated on 7 May 2004,

৩৪। UN Press Release Sc/7425.

৩৫। United Nations Peacekeeping; Department of Public Information (DPI) / 1827, UN, New York, August 1996, p-5

৩৬। Source: Armed Forces Division,

৩৭। "ONUMOZ : An Insight," Unpublished paper presented at the Army HQS by the Deputy Force Commander in 1995, p-4

৩৮। Ibid, p-5

৩৯। Ibid, p-7

৪০। Ali Zearat, T.A.Ibid, p-58

৪১। Ibid, p-58

৪২। Ibid, p-58-59

৪৩। " ONUMOZ: An insight" Ibid, p-15-16

৪৪। Ali Zearal T.A. Ibid, p-61

৪৫। United Nations Operations in Mozambique, UN Information Notes, Departmnt of Public Information, DPI/1306/Rev.4.February 1997,p-1-2.

৪৬। ONUMOZ : An Insight, Ibid, p-18-19

৪৭। United Nations Operations in Mozambique, Ibid, p-118

৪৮। Ali Zearat T.A, Ibid, p-65.

৪৯। Ibid, p-64.

৫০। ক্যাপ্টেন, মালিক, কায়সার হাসান মোঃ, ই,বেঙ্গল, সেনা বার্তা, (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা),সেনা বাহিনী প্রকাশ হতে,ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০২, পৃঃ ২০

৫১। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১

৫২। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯

Dhaka University Institutional Repository

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২

৫৫। ক্যাপ্টেন, ইসলাম সহিদুল মোঃ, সিগম, ব্যানসিগঃ সিয়েরা লিওনের সর্বত্র,সেনাবার্তা, (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা), সেনাবাহিনী প্রকাশ হতে,ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০২, পৃঃ ৩৫

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১

৫৮। ক্যাপ্টেন মালিক কায়সার হাসান মোঃ, ই, বেঙ্গল, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪

৫৯। লেঃ কর্নেল, জি, উদ্দিন আশরাফ মোঃ, পি এস সি, সিয়েরা লিয়নে ব্যানআর্টি-১ সেনাবার্তা (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা) সেনাবাহিনী প্রকাশ হতে, পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১, পৃঃ ৫৪ ।

৬০। ক্যাপ্টেন, ইসলাম শহিদুল মোঃ, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৮

৬১। ক্যাপ্টেন, মালিক কায়সার হাসান, মোঃ, ই,বেঙ্গল পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪

৬২। সাপ্তাহিক ২০০০, জানুয়ারী, প্রথম সংখ্যা, ২০০৪ ইং, পৃঃ ৩০,৩১ ।

৬৩। কমডোর রহমান, এম (ট্যাজ), (সিডি), এন ডি ইউ, পি এস সি, বি এন, "দেশ মাতৃকার উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ," বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৬ ইং ২১ নভেম্বর,দৈনিক আমার দেশ, পৃঃ ৯ ।

৬৪। কমডোর আজাদ এম এ কে (জি), পি এস সি, বি এন, "দেশ মাতৃকার উন্নয়ন ও গঠনমূলক কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী," বিশেষ ক্রোড়পত্র, সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০৫, ২১ নভেম্বর,দৈনিক আমার দেশ, পৃঃ ১০ ।

৬৫। কমডোর রহমান, এম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২

৬৭। পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা, বাংলাদেশ ।

৬৮। বাংলাদেশ টেলিভিশন সংবাদ, রাত ৮টা, ২১ নভেম্বর, ২০০৬ ইং ।

৬৯। স্কোয়াড্রন লীডার, হক রাফিউল মোঃ, পি এস সি, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২ ।

৭০। দৈনিক ইত্তেফাক, ২০-৮-০৬ ইং পৃঃ ৪, ২০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনা প্রবাহের মধ্য, দিয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত সংগঠন গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে জাতিসংঘ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ আন্তর্জাতিক সংগঠন বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব শান্তির পথে অভিনব বিস্ময়কর সৃষ্টি এবং সর্বোপরি মানব কল্যাণে এর অবদান অনস্বীকার্য্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস স্তুপের উপর মানব জাতির আশা আকাঙ্খা তথা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান ও পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ১৯২টি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘ।

১৯২ টি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সর্ববৃহৎ সংগঠন জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে জাতিসংঘ তার হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কখনো হয়েছে সফল আবার কখনো হয়েছে ব্যর্থ। এরূপ সফলতা ও ব্যর্থতার মাঝখানে পার হয়েছে ৬২টি বছর।

যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নির্বিচারী ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে সুন্দর এই পৃথিবীকে মুক্ত করে জননী বলে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের মহান ব্রত নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল জাতিসংঘ। কিন্তু একদিনের জন্যও যুদ্ধ কিংবা সংঘাত মুক্ত হয়নি এ বিশ্ব। আজ হয়তো রক্ত ঝরছে এখানে, কাল ওখানে। কখনো দেশে-দেশে, কখনো জাতিতে-জাতিতে, আবার কখনো বা জাতির অভ্যন্তরে।

এহেন আস্থিতিশীল অবস্থায় জাতিসংঘ কখনো চুপ করে বসে থাকেনি। অন্তত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সমস্যা সমাধানের মানসিকতা নিয়ে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় কিংবা হস্তক্ষেপে কম করে হলেও ৫০টির অধিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, যেগুলো পূর্বে উপনিবেশিক শাসন শোষনের পদতলে ছিল পিষ্ট। বর্ণবাদ, গোষ্ঠীবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ কিংবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সব সময় সোচ্চার। জাতিসংঘের ছায়াতলে অন্তত আরেকটি হিরোসিমা কিংবা নাগাসাকির জন্ম হয়নি পৃথিবীতে।

জাতিসংঘ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে একমাত্র বৈধ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ব সংস্থা বুঝায়। জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য হলো অশান্তি, যুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতার বিপরীতে এমন একটি বিশ্ব গড়ে তোলা যেখানে সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা পরিষদের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে সনদের কাঠামো ও ধারাসমূহের আওতায় নিবারক কূটনীতি, শান্তি স্থাপন ও শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে সংস্থাটির ক্ষমতাকে আরো জোরদার ও কার্যকর করা হয়েছে। তাই আশা জেগেছে এমন একটি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, ন্যায় বিচার ও মানবিক অধিকারসমূহ আদায় এবং সনদের ভাষায় " সামাজিক অগ্রগতি ও বৃহত্তর স্বাধীনতায় অধিকতর উন্নত জীবন মান" অর্জনে উৎসাহ যোগাতে সক্ষম।

জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম কৌশল হলো শান্তিরক্ষা কার্যক্রম। শান্তিরক্ষা হলো জাতিসংঘ কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন চুক্তি এবং ইহা মৌলিক সমস্যার চূড়ান্ত কোন সমাধান না হলেও এর মাধ্যমে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতিতে-জাতিতে, কিংবা রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বিরোধগুলো মেটানোর মাধ্যমে শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়াকে জোরদার করার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে পরিচিত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এমন একটি কৌশল যেখানে বহুজাতিক সৈন্যদের সমাবেশ ঘটে এবং জাতিসংঘের বিধি মোতাবেক শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন স্তরে সেবা প্রদানে নিয়োজিত থাকে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য রাষ্ট্র। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহনের সময় সীমা দুই যুগ পেরিয়ে গেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সূচনা ঘটে ১৯৪৮ সালে। তবে ১৯৫৬ সালে সুয়েজ বিরোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘাত, অস্থিরতা পরবর্তী সময় প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সেনা, নৌ, বিমান ও বেসামরিক পুলিশ বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহন করে ১৯৮৮ সাল থেকে এবং বর্তমানে বিভিন্ন মিশনে তারা সাহসী ও কার্যকরী ভূমিকা রেখে আসছে। পঞ্চাশ এর দশক থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ সময়ে জাতিসংঘ শুধু উপনিবেশিক শাসনের অবসানই ঘটায়নি বরং পৃথিবীর অনেক জটিল সমস্যার ও ফলপ্রসূ সমাধানে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে পৃথিবী ব্যাপী বহু উন্নয়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়েছে।

১৯৮৮ সালে প্রথম বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অংশগ্রহন করে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩১টি মিশনে অংশ গ্রহন করেছে। যার মধ্যে ২২টি মিশনের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত করেছে এবং ৯টির কার্যক্রম এখনও চলছে। ইরান-ইরাক Observer Mission এর মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীরা। কঠোর পরিশ্রম,মেধা আর দক্ষতা দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শান্তি স্থাপন করে দেশের সুনাম বৃদ্ধি করে আসছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ পর্যন্ত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর মোট ৪২,৮০১ জন সদস্য বিভিন্ন মিশনে কাজ করেছে। বর্তমানে বিভিন্ন মিশনে ১০ হাজারের অধিক সদস্য কর্মরত রয়েছে। সৈন্য প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা এক বিরাট সম্মান ও গৌরবের বিষয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশ সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করেছে।

এক সময় অনেকেই আমাদের সেনাবাহিনীকে অনুৎপাদনশীল ও অকার্যকর সেনাবাহিনী হিসেবে অভিহিত করত। কিন্তু এখন সে মন্তব্যটা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা প্রমানিত হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী এই সেনা সদস্যরা দেশমাতৃকা রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন শান্তিমিশন থেকে এ পর্যন্ত বাৎসরিক মোট ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪৬০০ কোটি টাকা আয় করেছে। কুয়েত পুর্নগঠন বাবদ যে অর্থ আয় হয়েছে তাসহ মোট ৬৬১, ৯৭, ৩৩, ১৭১ টাকা। এছাড়া সেনা সদস্যরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য যে সকল যানবাহন, অস্ত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে যায় তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের নিকট থেকে মোটা অংকের বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করে। আর্টিলারির কামান, যা ব্যবহারের উপায়ও নেই, আশংকাও নেই। তা থেকেও সরকার পায় বিপুল পরিমানের বৈদেশিক মুদ্রা। অর্থাৎ কোন রকম ব্যবহার বা ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই সাদা কামানের বিপরীতে আর্থিক লাভ হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এই অর্থ দেশের জন্য এক বিরাট অর্জন। অর্থাৎ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশ গ্রহন মানেই হলো বৈদেশিক মুদ্রার প্রাপ্তি এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি। এক কথায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অংশগ্রহন দেশটির বৈদেশিক নীতির সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রেখে আসছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হলো কারো সাথে শত্রুতা নয় বরং সকলের সাথে বন্ধুত্ব। পাশাপাশি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল কৌশল হলো সকল দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনে যোগ্য সমর্থন জ্ঞাপন করা। বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনী কর্তৃক জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সফল অংশগ্রহণ প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি শান্তিকামী দেশ এবং তা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জাতিসংঘের সনদের প্রতি আস্থাশীল এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী জাতিসংঘকে অধিকতর কার্যকরী করে তোলতে চায়। বাংলাদেশের সফল ও সাহসী অংশগ্রহণ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির সফলতা অনেকাংশে

Dhaka University Institutional Repository

দৃশ্যমান। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির স্লোগান অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর শান্তি মিশনে সফলতার কারনে।

জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল বয়ে নিয়ে এসেছে। জাতিসংঘের সফলতায় বাংলাদেশের অবদানকে বিশ্বের সফল জাতি রাষ্ট্র অকপটে স্বীকার করেছে। বাংলাদেশের শান্তি বাহিনীর শান্তিরক্ষা, শান্তি বাস্তবায়নসহ নানা প্রক্রিয়ায় সফলতার কারনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে লাভবান হচ্ছে। এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশ হয়েছে সকলের পরীক্ষিত বন্ধু। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে খ্যাত পরাশক্তিবর্গের কাছে হয়েছে আস্থার প্রতীক। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে পাচ্ছে বড় বড় পরাশক্তির সমর্থন।

বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের সফল ও স্বার্থক ভূমিকা বাংলাদেশের কূটনীতিকে করেছে অনেকাংশে সফল। বাংলাদেশের বর্হিঃবিশ্বে কূটনৈতিক মিশনগুলোর কর্মতৎপরতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে বড় বড় পরাশক্তি। কূটনৈতিকগণ জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে সফল হচ্ছে নানা ক্ষেত্রে। বড় বড় দ্বিপাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক চুক্তি বা সনদে বাংলাদেশ পাচ্ছে ইতিবাচক সাড়া ও সমর্থন। বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হলো অর্থনৈতিক কূটনীতির সফল বাস্তবায়ন। অর্থনৈতিক কূটনীতির বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সমর্থন এবং বড় বড় শক্তি বর্গের সমর্থন অনেকটা জরুরী। বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আজ এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্মেলনে বাংলাদেশ পাচ্ছে সাড়া ও সমর্থন। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কে করেছে উজ্জল। বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে জন নন্দিত ও স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ব্যাপক পরিচিতি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহায়তা করছে।

জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অংশ গ্রহনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনী লাভবান হচ্ছে কৌশলগত উৎকর্ষতার দিক থেকে। বাংলাদেশের সেনা,নৌ বিমান ও পুলিশ বাহিনীর অভিজ্ঞতা ও চৌকস এ দেশের জন্য সত্যিই লাভ জনক। সামরিক শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শান্তি মিশনে বাংলাদেশের অংশ গ্রহনে সহায়তা করছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচয় করে দিয়েছে সম্প্রীতি ও মানবতাকামী দেশ হিসেবে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সূচক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতা, আচার-আচরন সত্যিই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে। সিয়েরা লিওনে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষী বাহিনীর সফল কার্যক্রমের স্বীকৃতি সত্যিই বাংলাদেশের জন্য সর্বোচ্চ অর্জন। সিয়েরা লিয়নের জনগণ বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে, বলতে শুরু করেছে বাংলা ভাষা।

বাংলাদেশের জনগণের সম্মানার্থে সে দেশের সরকার তার দেশের একটি রোডের নামকরণ করেছে বাংলাদেশ নামে, বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সে দেশের অন্যতম ভাষা হিসেবে।

যোগ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনী সুনাম কুড়িয়েছে। তারা বিভিন্ন মিশনে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে প্রমান করেছে বাংলাদেশের নেতৃত্ব সৎ, যোগ্য, কার্যকরী ও সফল। জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশী সৈন্য সংখ্যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়ে সৈন্য প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে এসে পৌঁছেছে। এর কারণ হচ্ছে বাংলাদেশী সৈন্যদের আত্মত্যাগ, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নিরপেক্ষতা জাতিসংঘের সনদের প্রতি অবিচল আস্থা এবং যে কোন ঝুঁকিপূর্ন স্থানে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের সাহসিকতার সাথে কাজ করা। এছাড়া বাংলাদেশী সৈন্যদের মধ্যে কোন গোত্র বা বর্নগত সংঘাত নেই। যার ফলে যে কোন দেশে বা সমাজে কাজ করতে বাংলাদেশী শান্তি রক্ষীদের কোন অসুবিধা হয়না।

বাংলাদেশের জনগণ এরূপ সফলতার অংশীদার। জাতিসংঘে বাংলাদেশের উজ্জল ভাবমূর্তি এদেশের ১৪কোটি জনগণের জন্য গৌরবের বিষয়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয় ও সফল বটে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষক সহ নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষন করেননি। নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির তাত্ত্বিক ও বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের এরূপ সফলতাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তির প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির বাস্তবায়ন, স্বাধীন ও সার্বভৌত্বের জন্য অতন্দ্র প্রহরী সুলভ নিশ্চয়তার বিধান এবং বৈদেশিক মুদ্রার সহায়ক হিসেবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। উক্ত গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যৎ গবেষণা কর্মকে আরোও উৎসাহিত করবে। উক্ত গবেষণার মাধ্যমে উৎসাহী ব্যক্তি কিংবা

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থা মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা আফ্রিকা মহাদেশে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকাসহ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক ছাড়াও বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহু পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে শান্তিরক্ষী বাহিনীর অবদান কিরূপ তা নিয়ে গবেষণা করতে উৎসাহী হবেন।

সর্বোপরি, জাতিসংঘের শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা আরোও অধিকতর সফল ও স্বার্থক হবে এবং ফলশ্রুতিতে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা, সম্মান অধিকতর বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশ হবে সমগ্র বিশ্বের কাছে শান্তিকামী রাষ্ট্রের মডেল। উক্ত প্রত্যাশা বাংলাদেশের সকল জনগণের।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

Ali Zearal T.A. Bangladesh in United Nations Peacekeeping operations, BIISS Papers-16, Dhaka, July-1998.

Al Burns & N Heathcote, Peace-keeping by UN Forces: From Suez to the Congo, Pall Mall Press, New York, 1963.

A James, Peace keeping in International Politics, Mac Millan Academic and Professional Ltd, London, 1990.

AB Fetherston, Towards A Theory of United Nations Peacekeeping, Mac Millan Press Ltd, New York, 1994.

A Cassese ed : United Nations Peace-keeping: Legal Essays, Sijthoff & Noordh off International Publishers BV, The Netherland, 1978.

AC Isaak, Scope and Methods of Political Science, review, ed. The Dorsey Press, III, 1975.

A Roberts and B Kingsbury, ed. United Nations, Divided World : The UN's Roles in International Relations, Oxford, 1991.

Basic Facts About the United Nations, Department of Public Information, United Nations, New York, 1992.

BVA Roling, Peace Research and Peacekeeping in Cassese ed. The Netherlands, 1978.

BD Smith, United Nations Iran-Iraq Military Observer Group, in Durch.ed. New York.

Canada Reassesses Peacekeeping Role : Washington Post, 27 April, 1993.

C.C. Moskos. Jr, Peace Soldiers: The Sociology of a United Nations Military Force, University of Chieago press, Chieago, 1976.

D Wamer ed., New Dimensions of Peacekeeping, Martius Nijhoff Publishers, the Netherlands, 1995.

Dennis Wright, Islam and Bangladesh Polity, South Asia : Journal of South Asian Studies, 10 February 1987.

David Weinhouse, International Peace keeping, The John Hopkins University.

E Ahmed, ed, Foreign policy of Bangladesh : a small states imperative, University Press, Dhaka, 1984.

Ghali, Boutros-Boutros, (A),Building Peace and Development, Annual Report on the Work of the Organization, New York, Department of Public Information (DPI), UN, 1994.

Dhaka University Institutional Repository

H Wiseman ed; Peace-keeping: Appraisals and proposals, Pergamon Press, New York, 1983

Henry Kissinger, Diplomacy, New York, Simon & Schuster.

H Wiseman, United Nations Peacekeeping : A historical Overview, Pergamon Press, NY, 1983.

Huntingtong's Class of Civilization.

IJ Rikhye, M Harbottle & B. Egge, The Thin Blue Line: International Peace-keeping and its future, Yale University press, New Haven, 1974.

IJ Rikhye, The Theory & Practice of Peace keeping, C Hurst & company for IPA, London, 1984.

Inis Claude, "The Peace-keeping Role of the UN" in "The UN in Perspective" edited by E. Berkeley Tompkins.

J. M. Boyd, United Nations Peace-keeping Operations : A Military and Politieal Appraisal, Praeger Publishers Inc, NY,1971.

J Mackinlay, The Peacekeeprs : an Assessment of Peacekeeping Operations at Arab-Israel Interface, Unwin Hyman Ltd, London, 1989.

JG Merrils, International Dispute Settlement, 2nd ed, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1991.

James Adams : The Next World War.

Kofi A. Annan, Annual Report on the Work of the Organization-2001, UN. Department of public Information, NY.

K.P. Missro, The Role of the United Nations in the Indo-Pakistan Conflict-1971, New Delhi, 1976.

KN Waltz, Man, the state and the society of states, E Luard, ed. Mac Millan Press Ltd, London, 1992.

LL.Fabian, Soldiers Without Enemy, Preparing the United Nations for peace-keeping, Brookings Institution, Washington D.C.1971.

Mostafa Golam, The UN Peacekeeping Operations : Challenges and Options, Journal of International Relations (Hussain Akmol Ed.), Vol.1, No.-2, January-June-1994.

M. Harbottle, The Impartial Soldier, Oxford University Press, London, 1970.

Mehbub, Shafi M. (Colonel), The Bangladesh Military Contingent in the UNTAG: A post-mission Assessment, Mirpur Papers, DSCSC, Mirpur, Dhaka, Issue No.1, 1993.

Dhaka University Institutional Repository

Momen Nurul, Bangladesh in the United Nations : A study of Diplomacy, Dhaka, 1987.

N Pelcoits, Peacekeeping : The African Experience, H Wiseman, ed., Pergamon Press, New York.

Norton, August R, and Thomas G, Weiss, Superpower and Peace-keeper, Survival, Vol. XXXII, No. 3, May/June, 1990.

ONUMOZ : An Insight, Unpublished paper presented at the Army HQs by the Deputy Force Commander in 1995.

Peoples United Nations : Twenty five Years of Bangladesh in the United Nations, United Nations Information Centre, Dhaka, September 1999.

Peacemaking and peacekeeping for the next century, Report of the 25th Vienna Seminar, March-1995.

R Higgins, United Nations Peacekeeping 1946-1967 : Documents and Commentary, Oxford University Press, London, 1970.

R Mandel, The changing face of national security : a conceptual analysis, Greenwood Press, London, 1994.

Roberts, Adams, The United Nations and International Security, Survival, Vol.35, No. 2, Summer 1993.

Rahman, Habibur (Lt Col), "Overseas Employment of Army contingents: Prospects and Implications" Mirpur papers, DSCSC. Mirpur, Dhaka, Issue No, 1, 1993.

Rosalyn Higgins, United Nations Peace-keeping II, Asia, Oxford University Press, 1970.

Simons Geoff : The United Nations, MacMillan Press Limited, New York, 1994.

Sutterlin, James S, The United Nations and The Maintenance of International Security, London, Praeger, 1995.

The Blue Helmets, A Review of United Nations Peace-keeping, third edition, UN, Department of Public Information, New York, NY-August-1996.

The United Nations at 50-Notes for Peace keepers, Department of Public Information, UN, NY, August-1995.

The Blue Helmets, A Review of United Nations, Peacekeeping, 2nd Edition, UN, Department of Public Information, NY, August-1990.

T Schelling, The Strategy of Conflict, Center for International Affairs, Harvard University Press, 1960.

Dhaka University Institutional Repository

Talukder Moniruzzaman, Politics and Security of Bangladesh, University Press Limited, Dhaka, 1993

Thomas Oliver, The United Nations in Bangladesh (1971), NJ, USA.

United Nations Peacekeeping (1948-2001), Department of Public Information, UN, New York, 2001.

United Nations Peacekeeping, Department of Public Information, UN, NY, August-1996.

United Nations Peacekeeping Operations : Background Notes, Department of Public Information, UN, New York, May 1997.

United Nations Operations in Mozambique, UN Information Notes, DPI/1306/Rev.4, February, 1997.

United Nations Peacekeeping and the war in former Yugoslavia, Grein Press Limited. 1995.

WJ Durch, ed, The Evolution of UN Peace keeping: Case studies & comparative Analysis, st, Martins Press, New York, 1993.

William D. Morgan and Charles Stuart Kennedy ed. American Diplomats, New York, 2005.

WJ Durch, The Iraq-Kuwait Observer Mission, St. Martin's Press Inc, NY, 1993.

Waliullah, Lt. Col. AEC, AS I See, Sierra Leone, Ahmed Publishing House, Dhaka, 2004.

কামাল, মোস্তফা ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০২ ।

কালাম, আবুল (সম্পাদিত), সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া, উচ্চতর সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯২ ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ১৯৯১ ।

ঘালি বুট্রোস বুট্রোস, শান্তির লক্ষ্যে কর্মসূচী, মোমেন নূরুল ডঃ (অনু), জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৩ ।

মোমেন নূরুল ডঃ (অনুবাদক)ঃ জাতিসংঘ সনদ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, অক্টোবর-২০০১,

মিয়া মনিরুজ্জামান মোহাম্মদ; সমসাময়িক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, কাকলী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি-২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখোপাধ্যায় শক্তি ও মুখোপাধ্যায় ইন্দ্রানী, "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, সংগঠন ও পররাষ্ট্রনীতি", দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭-এ কলেজ স্ট্রীট; কলিকাতা-৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল জুন-১৯৯২।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, তৃতীয় বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৫।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ঢাকা-২০০০।

মান্নান, আবদুল, মোঃ অধ্যাপক ও মেরী সামসুন্নাহার খানম, সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি,অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, মার্চ-২০০৬।

ড. আলম, মুরশিদ, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, নিলার্ভা পাবলিকেশনস্, ঢাকা।

ড. রহমান, আজিজুল, সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি, হাসান বুক হাউস, ঢাকা।

রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ আজকের জাতিসংঘ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা আগস্ট-১৯৯৫।

রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ ধারণা ও বাস্তবতা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, অক্টোবর-২০০১।

রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ অল্প কথায় জাতিসংঘ সনদ, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, অক্টোবর-২০০১।

রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ জাতিসংঘ সম্পর্কে তোমরা যা জানতে চাও, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, নভেম্বর-২০০২।

রেজা কাজী আলী (সম্পাদিত) ঃ জাতিসংঘে বাংলাদেশের পঁচিশ বছর, "জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র", ঢাকা, বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর-১৯৯৯।

রহমান আতাউর ঃ সংকিঞ্চিত, প্রবন্ধ ঃ যুদ্ধের যন্ত্রণা, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৯৯।

রহমান, আতীকুর, এ এস এম, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৫।

শাহেদ মোহাম্মদ সৈয়দ (সম্পাদিত) ঃ জাতিসংঘের পঞ্চাশতম বার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি, ঢাকা, ডিসেম্বর-১৯৯৫।

হালিম, আব্দুল, মোঃ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলনীতি, ব্র্যাক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, "বাংলাদেশ ১৯৯৬, রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি", আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

হোসেন তোফাজ্জল, জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, বই মেলা ২০০৭।

UN Press Release SC/7425

UN Press Release S/2001/760

UN Press Release S/2000/172

UN Press Release GA/PK/2002/175

Dhaka University Institutional Repository

UN Press Release GA/PK/2002/174

Special UN Report, DPI/1634/Rev-2, March-1996

United Nations Peacekeeping, DPI/1827, UN, New York, August-1996.

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১-১১-২০০৪

দৈনিক ইত্তেফাক, ০১-০৪-২০০৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০-০৮-২০০৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১-১১-২০০৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮-০৮-২০০৬

দৈনিক ইত্তেফাক, ০৬-০৩-২০০৭

দৈনিক আমার দেশ, ২১-১১-২০০৩

দৈনিক আমার দেশ, ২১-১১-২০০৫

দৈনিক আমার দেশ, ২১-১১-২০০৬

দৈনিক নয়াদিগন্ত, ০৪-০১-২০০৭

দৈনিক মানবজমিন, ২১-১১-২০০৩

সেনাবার্তা, পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০১ ।

সেনাবার্তা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্রৈ-মাসিক পত্রিকা, সেনাবাহিনী প্রকাশ হতে, ষোড়শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মার্চ ২০০২ ।

সাপ্তাহিক ২০০০, জানুয়ারি, প্রথম সংখ্যা, ২০০৪ ।

The Daily Star, Dhaka, 16 October 2001

The Daily Star, 29 October, 2001

Bangladesh Today, 22-10-2003.

The Independent, Dhaka, 9-5-1998

The Independent, Dhaka, 14-5-2001.

The Indepent, Dhaka, 2-12-2001.

The Independent, Dhaka, 27-2-2005.

The New Age, Dhaka, 7-6-2003.

The Daily Observer, Dhaka, 23-9-2003.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

UN MISSIONS PAST AND PRESENT

Serial	Name of the Mission	Duration
1.	UNTSO- UN Truce Supervision Organization (Palestine)	June-1948 to Present
2.	UNMOGIP- UN Military Observer Group in India and Pakistan	Jan- 1949 to Present
3.	UNEF-1- First UN Emergency Force (Middle East)	Nov.-1956 to June 1967
4.	UNOGIL- UN Observation Group in Lebanon	June-1958 to Dec.-1958
5.	UNOC- UN Operation in the Congo	July- 1960 to June-1964
6.	UNSF- UN Security Force in Western New Guinea.	Oct-1962 To April-1963
7.	UNYOM Yemen Observation Mission	July-1963 to Sept 1964
8.	UNFICYP- UN peace keeping Force in Cyprus	March-1964 to Present
9.	DOMREP- Mission of the Representative of the Secretary General in the Dominican Republic	May-1965 to Oct 1966
10	UNIPOM- UN India-Pakistan Observation Mission	Sept- 1965 to March-1966
11	UNEF-II Second UN Emergency Force (Middle East)	Oct-1973 to July 1979
12	UNDOF- UN Disengagement Observer Force (Syria)	June-1974 to Present.
13.	UNIFIL- UN Interim Force in Lebanon	March- 1978 to present.
14.	UNGOMAP- UN Good officers Mission in Afghanistan and Pakistan	May 1988 to March-1990
15.	UNIIMOG- UN Iran-Iraq Military Observer Group	Aug- 1988 to Feb- 1991
16.	UNAVEM-I UN Angola Verification Mission-I	Jan- 1989 to June 1991
17.	UNAVEM-II- UN Angola Verification Mission-II	June- 1991 To Feb-1995

Dhaka University Institutional Repository

18.	UNTAG- UN Transition Assistant Group (Namibia)	April-1989 to March-1990
19.	ONUCA- UN Observe group in central America	Nov- 1989 to Jan. 1992
20.	UNIKOM- UN Iraq-Kuwait Observer Mission	April-1991 to Present
21.	ONUSAL- UN Observation Mission in El. Salvador	Juy 1991 to April 1995.
22.	MINURSO UN Mission For the Referendum in Western Sahara	April-1991 to present
23.	UNAMIC- UN Advance Mission in Combodia	Oct-1991 to March-1992
24.	UNPROFOR- UN Protection Force (Former Yugoslavia)	Feb 1992 to Dec. 1995
25	UNTAC-UN Transitional Authority in Combodia	March-1992 to Sept 1993
26	UNOSOM-1- UN Operation in Somalia	April-1992 to March-1993
27.	UNOSOM-II- UN Opertion in Somalia-II	March-1993 to March 1995
28.	ONUMOZ- UN Operation in Mozambique	Dec 1992 Dec 1994
29.	UNOMUR- UN Observer Mission Uganda-Rwanda	June 1993-Sept- 1994
30.	UNOMIG- UN Observer Mission in Georgia	Aug 1993 to Present
31.	UNOMIL- UN Observer Mission in Liberia	Sept 1993- Sept 1996
32.	UNMIH- UN Mission in Haiti	Sept 1993-June 1996
33.	UNAMIR- UM Assistant Mission In Rwanda	Oct 1993- Mar 1996
34	UNASOG-UN Aouzou Strip Observer Group	May 1994- June 1994
35.	UNMOT- UN Mission of Observers in Tajikistan	Dec 1994-May 2000
36.	UNAVEM III-Un Angola Verification Mission III	Feb- 1995- June 1997

Dhaka University Institutional Repository

37.	UNCRO- UN Confidence Restoration Operation in Croatia	March 1995-Jan 1996
38.	UNSMA-UN Special Mission to Afghanistan	1998-2000
39.	UNTAES- UN Transition Assistance Mission in Eastern Slovenia	Jan 1996-Jan 1998
40.	UNPREDEP- Un preventive Deployment Force (Mecedonia)	Mar 1995- Feb 1999.
41.	UNMIBH- UN Mission in Bosnia and Herzegovina	Dec 1995 to present
42.	UNMOP- UN Mission of Observers in Prevlaka	Jan 1996 to present
43.	UNGCI- Un Guards Contingent in Iraq	1996 to present
44	MINUGUA-UN Verification Mission in Guatemala.	Jan 1997- May 1997
45	UNCIVILIAN POLICE SUPPORT GROUP	Jan 1998-Oct 1998
46	MINURCA- UN Mission in the Central African Republic	April 1998-Feb 2000
47	UNOMSIL-UN Observer Mission in Sierra Leone	July 1998- Oct 1999
48	UNMIK-UN Interim Administration Mission in Kosovo	June 1999 to present
49.	UNAMSIl- UN Assistance Mission in Sierra Leone	Oct 1999 to present
50.	UNTAET- UN Transitional Administration in East Timor	Oct 1999 to present
51.	MONUC- UN Organization Mission in Democratic Republic of the Congo	Nov 1999 to present
52.	UNMEE- UN Mission in Ethiopia-Eritrea	July 2000 to present.

REF: The blue helmets- A review of United Nations Peace keeping, Third editiion, 31st March-1996, published by the United Nations Dept, of Public Information, New York, NY, 10017, Chapter-2.P. 689-690.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

UN PEACEKEEPING MISSIONS

PARTICIPATED BY BANGLADESH

1.	UNIKOM	UN Iraq Kuwait Observer Mission
2.	MINURSO	UN Mission for the Referendum in Western Sahara
3.	UNPREDEP	UN Preventive Deployment Force
4.	UNOMIG	UN Observer Mission in Georgia
5.	UNMOT	UN Mission of Observes in Tajikistan.
6.	UNAVEM	UN Verification Mission in Angola.
7.	UNGEL	UN Guard Contingent in Iraq
8.	UNIIMOG	UN Iran-Iraq Military Observer Group
9.	UNTAG	UN Transition Assistance Group (Namibia)
10.	UNAMIC	UN Advance Mission in Combodia.
11.	UNTAC	UN Transitional Authority in Combodia
12.	UNMLT	UN Military Liaison Team (Combodia)
13.	UNOSOM	UN Operation in Somalia
14.	UNAMIR	UN Assistance Mission for Rwanda
15.	UNMIH	UN Mission in Haiti
16.	ONUMOZ	UN Observer Mission in Mozambique.
17.	UNPROFOR	UN Protection Force (Former Yugoslavia)
18.	UNMOP	UN Mission of Observers in prevlika (Croatia)
19.	UNTAES	UN Transitional Administration in E. Slovenia.
20.	UNSMA	UN Special Mission to Afghanistan
21.	UNOMIL	UN Observer Mission in Liberia
22.	UNAMSIL	UN Assistance Mission in Sierra Leone.
23.	UNTAET	UN Transitional Administration in East Timor
24.	UNMIK	UN Mission in Kosovo
25.	MONUC	UN Observer Mission in Congo
26.	UNMEE	UN Mission to Ethiopia-Eritrea.

Ref. Prepared by a group of Military officers, Defence Service Command and Staff College, Mirpur, Dhaa, Bangladesh (2003).

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

ক্রমিক নং	মিশনের নাম	বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা
১	ইরান-ইরাক জাতিসংঘ সামরিক পর্যবেক্ষক মিশন (UNIIMOG)	৩১
২	ইরাক-কুয়েত জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন (UNIKOM)	৮১২৩
৩	তাজাকিস্তানে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন (UNIMOR)	৩৯
৪	ইরাকে জাতিসংঘ প্রহরী দল (UNGCI)	১২১
৫	আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহায়ক মিশন (UNSMA)	২
৬	জর্জিয়ায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন (UNOMIG)	৮৮
৭	কম্বোডিয়ায় জাতিসংঘ সহায়ক মিশন (UNAMIC) [পরবর্তীতে কম্বোডিয়ায় অন্তবর্তীকালীন কর্তৃপক্ষ] (UNTAC)	১০০২
৮	কম্বোডিয়ায় জাতিসংঘ সামরিক লিয়াজোঁ দল (UNMLT)	১
৯	সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় জাতিসংঘ সংরক্ষণ বাহিনী (UNPROFOR) [পরবর্তীতে প্রেভলাংকা পর্যবেক্ষক মিশন] (UNMOP)	১৪৩৫
১০	পূর্ব শ্লোভেনিয়া জাতিসংঘ প্রশাসন (UNTAES)	১৭
১১	মেসোডোনিয়ায় জাতিসংঘ নিবারক বাহিনী (UNPREDEP)	৪
১২	রুয়ান্ডায় জাতিসংঘ সহায়ক মিশন (UNAMIR)	১০১২
১৩	লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন (UNOMIL)	১৩৩
১৪	অ্যাঙ্গোলায় জাতিসংঘ ভেরিফিকেশন মিশন (UNAVEM)	৯
১৫	অ্যাঙ্গোলায় জাতিসংঘ ভেরিফিকেশন মিশন (UNAVEM-III)	৪৭৬
১৬	নামিবিয়ায় জাতিসংঘ অন্তবর্তী সহায়ক দল (UNTAG)	২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৭	সোমালিয়ায় জাতিসংঘ কার্যক্রম (UNOSOM)	৫
১৮	সোমালিয়ায় জাতিসংঘ কার্যক্রম-২ (UNOSOM-2)	১৯৬৯
১৯	মোজাম্বিকে জাতিসংঘ কার্যক্রম (UNOMOZ)	২৫১৮
২০	উগান্ডা/রুয়ান্ডায় জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন (UNOMUR)	২০
২১	হাইতিতে জাতিসংঘ মিশন (UNMIH)	২০৪২
২২	পশ্চিম সাহারা জাতিসংঘ গণভোট মিশন (MINURSO)	৬৯
২৩	কঙ্গোতে জাতিসংঘ সাংগঠনিক মিশন (MONUC)	১৩৮৫
২৪	সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ সহায়তা মিশন (UNAMSIL)	১০৯৩৮
২৫	পূর্ব তিমুরে জাতিসংঘ অগ্রবর্তী মিশন (UNAMET) [পরবর্তীতে পূর্ব তিমুর সহায়ক মিশন (UNMISET)]	১১৭৩
২৬	কসোভোয় জাতিসংঘ মিশন (UNMIK)	৫
২৭	ইথিওপিয়া / ইরিত্রিয়ায় জাতিসংঘ মিশন (UNMEE)	৫২৪
২৮	লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘ মিশন (UNMIL)	৮০৩
২৯	কোঁতে দ্য আইভরিতে জাতিসংঘ কার্যক্রম (UNOCI)	২৮৮৬
৩০	সুদানে জাতিসংঘ অগ্রবর্তী মিশন (UNAMIS)	৩
৩১	বুরুন্ডিতে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মিশন (UNOB)	২

হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত বাংলাদেশের আনুমানিক ৩৮,০০০ জন শান্তিরক্ষী জাতিসংঘের কার্যকমে অংশ নিয়েছে।

সূত্র ঃ হোসেন, তোফাজ্জল, জাতিসংঘ, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ইং, পৃ.-৫২৮।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

Assignments Completed by Bangladesh

(As on November 1, 1997)

Sl. No.	Name of Missions	Observers	HQ Staff	Army	Navy	Air Force	Total
1	UNIIMOG (Iraq)	31	-	-	-	-	31
2	UNTAG (Namibia)	25	-	-	-	-	25
3	UNTAC (Cambodia)	31	7	965	-	-	1003
4	UNOSOMI (Somalia)	5	-	-	-	-	5
5	UNOMUR (Uganda/Rwanda)	20	-	-	7	-	27
6	UNOSOM II (Somalia)	-	21	1946	-	2	1969
7	ONUMOZ (Mozambique)	56	84	2328	14	39	2521
8	UNAMIR (Rwanda)	107	29	854	7	15	1012
9	UNMIH / MNF (Haiti)	-	39	1901	51	52	2043
10	UNIKOM (Kuwait)	93	-	3116	3	67	3279
11	MINURSO (W. Sahara)	35	-	-	-	-	35
12	UNPROFOR (Yugoslavia)	148	13	1239	12	25	1437
13	UNOMIL (Liberia)	42	-	87	18	21	168
14	UNOMIG (Georgia)	33	-	-	6	5	44
15	UNMOT (Tajikistan)	28	-	-	2	2	32
16	UNAVEM III (Angola)	30	22	413	7	6	478
17	(Croatia/Bosnia)	-	-	-	1	-	1
Total		684	215	12,849	128	234	14,110

Ref: T.A. Zeart Ali, BIISS papers, Number-16, 1998, Page-40.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

Bangladesh's on-going peacekeeping operations

(As on December 1 1997)

Serial No.	Name of Missions	Type of Missions	Army	Navy	Air Force	Total
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	UNIKOM	Observer	5	-	-	5
		Mechanical Contingent	767	-	-	767
		BANAIR	-	-	35	35
		UNGCI (Guard)	14	3	3	20
2	MINURSO	Observer	6	-	-	6
3	UNTAES	Observer	9	-	-	9
4	UNOMIL	Observer	1	-	-	1
5	UNOMIG	Observer	1	-	-	1
6	UNMOT	Observer	5	1	1	7
7	UNAVEM	Observer	6	2	2	10
		Professional Personnel	3	-	-	3
		BEC-2 (Engrcoy)	90	-	-	90
8	UNSMA	Staff	2	-	-	2
9	UNPREDEP	Observer	-	-	1	1
Total			916	9	44	969

Ref: T.A. Zeart Ali, BIISS papers, Number-16, 1998, Page-40.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

On Going Missions (As 30 Sep 2001)

Presently our peacekeepers are serving in 10 different countries of the world. A total of 5866 personnel are deployed presently as Military observers, Military Liaison Officers, Staff Officers and Contingent Members.The detail statistics has been shown in the following table :

	Name of Mission	Status	Strength									Total
			Army			Navy			Air Force			
			Offr	OR	CIV	Offr	OR	CIV	Offr	OR	CIV	
1.	UNIKOM (kuwait) 2IE Bengal Co : Col, Md Jainul Abdein Banair-6; Wg Cdr Mofiz	UNMO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		BANBAT-8	61	694	12	-	8	-	-	-	-	775
		BANAIR-7	-	-	-	-	-	-	9	23	3	35
2	UNTAET (East Timor) BANENGR-2 Co. Col Faruque	UNMO	5	-	-	1	-	-	1	-	-	7
		Staff	6	9	-	-	-	-	-	-	-	15
		BANENGR-2	24	448	53	-	-	-	-	-	-	525
3	UNAMSIL (Sierra Leone) BANSEC HQ. BANBAT-1 & 2 Comd. Brig Gen Ali Hasan	MLO	10	-	-	2	1	-	03	1	-	17
		Staff	11	3	-	-	-	-	-	-	-	19
		Contingent	346	3,794	104	-	-	-	-	-	-	4247
4.	MONUC (Congo)	MLO/Staff	19	-	-	-	-	-	3	-	-	22
5.	MINURSO (W. Sahara)	UNMO	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6
6.	UNOMIG (Georgia)	UNMO	7	-	-	1	-	-	1	-	-	9
7	UNGCL (Iraq)	UN Guards	11	-	-	3	-	-	2	-	-	16
8	UNMOP (Previaka)	UNMO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
9	UNMIK (Kosovo)	MLO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10.	UNMEE (Ethiopia/Eritrea)	Staff/ UNMO	12	1	-	-	-	—	-	-	-	13
		Contingent	10	146	4	-	-	-	-	-	-	160
Total			535	5,095	173	8	9	-	19	24	3	5,866

Ref. Prepared by a group of Military officers, Defence Service Command and Staff College, Mirpur, DhaKa, Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

Summary of Completed Deployment

MISSION	STATUS	ARMY	NAVY	AIR	TOTAL
MINURSO (W. Sahara)	UNMO	61	2		63
	STAFF				
	CONT				
MONUC(Congo)	UNMO	31	3	6	40
	STAFF	20		2	22
	CONT				
ONUMOZ (Mozambique)	UNMO	56	4	1	61
	STAFF	84		6	90
	CONT	2328	11	32	2371
UNAMIC UNTAC (Combodia)	UNMO	30			30
	STAFF	7			7
	CONT	965			965
UNAMIR (Rwanda)	UNMO	107	5	9	121
	STAFF	29			29
	CONT	854	2	6	862
UNAMSIL (Sierra Leone)	UNMO	48	5	4	57
	STAFF	40	4	5	49
	CONT	9279			9279
UNAVEM (Angola)	UNMO			7	7
	STAFF				
	CONT			2	2
UNAVEM III (Angola)	UNMO	31	9		40
	STAFF	23			23
	CONT	413			413
UNGCI (Iraq)	UNMO	90	18	13	121
	STAFF				
	CONT				

Dhaka University Institutional Repository

UNIIMOG (Iraq)	UNMO	31			31
	STAFF				
	CONT				
UNIKOM (Kuwait)	UNMO	84		2	86
	STAFF				
	CONT	7712	46	279	8037
UNMEE (Ethiopia/Eritrea)	UNMO	13			13
	STAFF	15			15
	CONT	320			320
UNMIH (Haiti)	UNMO		2	1	3
	STAFF	39	3	8	50
	CONT	1901	46	43	1990
UNMIK (Kosovo)	UNMO	4			4
	STAFF				
	CONT				
UNMISET/ UNATET (East Timor)	UNMO	38	3	3	44
	STAFF	36			36
	CONT	1050			1050
UNMLT (Combodia)	UNMO	1			1
	STAFF				
	CONT				
UNMOT (Tazikistan)	UNMO	34	3	3	40
	STAFF				
	CONT				
UNMOVIC	Inspector		2	1	3
UNOMIG (Georgia)	UNMO	58	12	11	81
	STAFF				
	CONT				
UNOMIL (Liberia)	UNMO	42	9	21	72
	STAFF				
	CONT	87	9		96

Dhaka University Institutional Repository

UNOMUR (Uganda/Rwanda)	UNMO	20			20
	STAFF				
	CONT				
UNOSOM (Somalia)	UNMO	5			5
	STAFF				
	CONT				
UNOSOM II (Somalia)	UNMO				
	STAFF	21			21
	CONT	1946		2	1948
UNPREDEP (Mecedonia)	UNMO	4			4
	STAFF				
	CONT				
UNPROFOR UNMOP (Bosnia)	UNMO	129	7	21	157
	STAFF	13	1		14
	CONT	1239	9	6	1254
UNSMA (Afghanistan)	UNMO				
	STAFF	2			2
	CONT				
UNTAES (E. Slovenia)	UNMO	17			17
	STAFF				
	CONT				
UNTAG (Namibia)	UNMO	25			25
	STAFF				
	CONT				
Total		29382	215	494	30091

Ref : Army Head Quarter, Dhaka-Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

Summary of completed Deployment

	Army	Navy	Air	Total
UNMO	959	64	102	1125
STAFF	329	10	21	360
CONT	28094	114	370	28605
OTHERS			1	1
Total	29382	215	494	30091

পরিশিষ্ট-৯

Summary of Current Deployment

MISSION	STATUS	ARMY	NAVY	AIR	TOTAL
MINUCI (Ivory Coast)	CMLO	1			1
MINURSO (W. Sahara)	UNMO	6	2		8
MONUC (Congo)	UNMO	9	3	3	15
	STAFF	7		2	9
	BANMP 1	20	4	4	28
	TF HQ	23	2		25
	BANBAT-I	909	16		925
	LOG ELM	100			100
	TFMP UNIT-1	12	2	2	16
	BANAIR AVN UNIT-1			130	130
	AIR FD SP UNIT			79	79
UNAMSIL (Siera Leone)	UNMO	12	2	1	15
	STAFF	11	4	2	17
	BANSEC HQ3	65			65
	CONT (BB 8)				0
	CONT (BB 9)	776			776
	CONT (BS3)	402			402
	CONT (BE3)	159			159
	CONT (BM3)	70			70

Dhaka University Institutional Repository

UNMEE (Ethiopia/Eritrea)	UNMO	5	1	1	7
	STAFF	4			4
	CONT (BE3)	160			160
	MDD	8			8
UNMIK (Cosovo)	MLO	1			1
UNMIL (Liberia)	OBSERVER	4			4
	STAFF	6		1	7
	BANBAT1	802			802
	BANENGR1	59			59
	BANMED1	60			60
UNOMIG (Georgia)	CMO	1			1
	UNMO	6	1	1	8
UNTAET/UNMISET (E. Timor)	UNMO	5			5
	BAF CONT			34	34
GRAND TOTAL		3704	37	260	4001

Summary of current deployment

	Army	Navy	Air	Total
UNMO	47	9	6	62
Staff	29	4	5	38
CONT	3625	24	249	3898
Others	3			3
Total	3704	37	260	4001

Ref: Army headquarter, Dhaka, Bangladesh (2003)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

শান্তিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের পদমর্যাদা অনুযায়ী (বেতন ও ভাতা নিম্নরূপ)ঃ

Rank	Monthly Pay (US$)
Major General and equivalent	3500
Brigadier and equivalent	3000
Colonel and equivalent	2600
Lieutenant colonel and equivalent	2400
Major and equivalent	2200
Captain and equivalent	2000
Lieutenant and equivalent	1800
Honourary captain/Leiutenant Master Warrant Officer and equivalent	1400
Senior Warrant Officer and Equivalent	1200
Warrant Officer and Equivalent	1100
Sergeant and equivalent	1000
Corporal and equivalent	900
Lance Corporal and equivalent	800
Sainik and equivalent	750
Non Combatant (Enrolled)/ others and equivalent	700

Ref: Army headquarter, Dhaka, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১

Record of Various Death cases in UN Mission (As on 30 Sep, 2001)

Sl. No.	Rank & Name	Army Svcl	Msn Name	Dt. of Death	Reason
1.	B.A-925 Lt Col Faizul Karim	EB	UNTAG	04 Apr 89	Traffic Accident
2.	BA-1482 Lt. Col Mohammad Hossain	Sig	UNOMEG	09 Mar 96	Mine explosion
3.	BA-2755 Maj Alamgir Mohammad Sarwar Hossain	AC	UNGCI	09 May 98	Traffic Accident
4.	BA-4444 Capt Md. Quamruzzaman	Arty	UNAMSIL	21 March 02	"
5.	BJO-10046 WO MA Haroon Ur-Rashid	AC	UNIKOM	12-Aug- 94	En Ambush
6.	BJO-20593 WO Md. Nurul Isalm	AMC	UNAMSIL	21 Aug 02	CEREBRO VASCULAR Accident
7.	4000702 Pvt Md. Yousuf Ali	EB	UNTAC	28-Mar-93	Hit of Rocket Splinter
8.	3980039 Lept Sanwar Hossain	EB	UNOMOZ	15-Aug-93	Electric Shock
9.	4000617 Pvt. Md. Akbar Hossain	EB	UNOSOM	29-Dec-93	Traffic Accident
10.	3986951 Pvt Md Ismail Hossain	EB	UNPROFOR	13-Dec-94	Missile Attack
11.	4110496 Pvt. Md. Abdul Hai Mondol	Engrs	UNPROFOR	03-Dec-94	Heart Failure
12	3990395 Lept Md. Foyez Ahmed	EB	UNIKOM	01-Feb-97	Traffic Accident
13	1210603 Lept Md. Abdur Rahim	Arty	UNMIH	24-Jan-96	Traffic Accident
14	1431446 Cpl Md. Abdul Aziz	Engrs	UNTAET	03-Aug-00	Mine Explosion
15.	1213444 Cpl Md. Mizanur Rahman	Arty	UNAMSIL	21-Mar-02	Traffic Accident
16	1213935 Lept Md. Mokaddes Hossain	Arty	UNAMSIL	21-Mar-02	Traffic Accident

Dhaka University Institutional Repository

17.	123160 Pvt. Md. Aminur Islam	Arty	UNAMSIL	21-Mar-02	Traffic Accident
18.	1803952 cpl Md. Abdul Mannaf	ASC	UNAMSIL	05-Feb-02	Traffic Accident
19.	1210554 cpl Md. Zafar Ullah	Arty	UNAMSIL	04-Jan-02	Cerebral Malaria
20	2004349 Lept Bellal Hossain	AMC	UNIKOM	10 Oct-01	Cancer
21	CS 110366 Mess Waiter Md. Alauddin Hawlader	-	UNIKOM	03-Aor-94	Heart Failure
22	BJO-42501 WO Md. Lutfor Rahman	EB	UNAMSIL	10-Sep-2003	Malaria

Ref: Army headquarter, Dhaka, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১২

LIST OF PERSONS INJURED IN DIFFERENT UN PEACEKEEPING MISSIONS WHILE ON DUTY

(AS ON 30 SEP 2001)

Ser	Rank	Name	Mission	Cause	Date of Cas.
1.	WO	Niranjan Kumar Bhowmic, AC	UNPROFOR (F. Yugoslavia)	Msl. Attk by en during sup of food and POL	12 Dec 94
2.	L.Cpl	Anisur Rahman, EB	"	"	"
3.	L Cpl	Md. Shafiqul Islam, EB	"	"	"
4.	Sainik	Md. Mahbubur Rahman, AC	"	"	"
5.	Sainik	Md. Enayet Hossain Khan, EB	"	Mil tpt accident while on duty	28 oct 94
6.	Capt	SM Mahmud Hasan, EB	"	"	17 Jan 95
7.	Sainik	Md. Masudul Islam, EB	"	"	"
8.	Sainik	Azhar Uddin, Arty	"	"	"
9.	Sainik	Md. Saiful Islam, EB	"	Msl attk by en while on duty	31 Oct 94
10.	Sainik	Md. Azmol Hossain, Sigs	"	"	"
11.	cpl	Md. Ferdous Ali, EB	"	SA Firing by en while on duty	08 Aug 95
12.	Sainik	Kazi Monirul Haque, EB	"	Injured due to hostile firing while on duty	21 July 95
13.	Maj	Humayun Bakth Chowdhury, EB	"	Mine expl in msn area	28 Jan 94
14.	Sgt	Muhammad Yousuf Ali, EB	UNOSOM (Somalia)	Mil tpt accident while on duty	22 Dec 94
15.	L Cpl	Yeakub Ai, EB	"	SA firing by Somali Militia while on duty	06 Mar 94
16.	cpl	Md. Monir Hossain Ac	"	"	06 Dec 94
17.	cpl	Shah Alam, Arty	"	"	"
18.	Sainik	Md. Emdad Hossain, EB	"	"	"
19.	Maj	Md. Munshi Ahsanur Rahman, Sigs.	UNAMIR (Rwanda)	On the veh while on duty	17 June 94

Dhaka University Institutional Repository

20.	WO	Md. Abdul Motaleb EME	"	"	11 April 94
21.	WO	Md. Harun-Or-Rashid, EB	"	"	07 April 94
22.	Capt	Md. Anis Uz Zaman Polash, ASC	ONUMOZ (Mozambique)	Mil tpt accident while on duty	18 Dec 93
23.	Sgt	Md. Abdus Salam, ASC	"	"	"
24.	Sainik	Kazi Kabir Ahmed Mozumder, Sigs	"	"	"
25.	Maj	Aaj Md. Ahsanuzzaman EB	"	While undergoing trg at unit trg grd in Mozambique	10 Aug 98
26.	Sgt	Md. Aminul Haque EB	UNMIH (Haiti)	"	18 Nov 95
27.	Maj	Tameem Ahmed Chowdhury, EB	UNTAC (Combodia)	Hit by splinter while on duty	27 May 93
28.	Lt. Col	Seikh Nurul Amin PSC, Arty	UNGCI (Iraq)	Mil tpt accident while on duty	09 May 98
29.	Maj	Md. Aminul Haque PSC, G, Arty	UNIKOM (Kuwait)	"	
30.	Maj	Md. Zahirul Islam Arty	UNOMIG (Georgia)	Ambushed by Georgian Militia while on duty	07 Oct 98
31.	Maj	Md. Nasim Akhter PSC, EB	"	"	21 Sep 98

Ref: Army headquarter, Dhaka, Bangladesh

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৩

SOCIO ECONOMIC ACTIVITIES OF BANGLADESH CONTINGENT IN SIERRA LEONE

Serial	Date	Location	Name of the Project/Activities	Remarks
1	Mar – Nov 2002	Magburaka	Construction of Bangla-Sierra Friendship Vocational Training Institute	Completed
2	Mar – Nov 2002	Magburaka	Distribution of sport items among the . local young boys	
3	Aug 2002	Masingbi	Distribution of carpentry tools among the ex- combatants	
4	Mar 2002	Magburaka	Donation of a power tiller to the BANSAL Agriculture Farm	
BBANENGR 1				
1.	Mar 2001	Lunsar Road	Construction of a 30 feet DS bailey bridge at Lunsar	Completed
2.	Apr 2001	Songo Road	Repair of bailey bridge at Songo	Completed
3	May 2001	Masiaka - Rogberi Junction	Maintenance of road from Masiaka – Rogberi junction	Completed
4	Jun 2001	Magburaka	Improvement and levelling of airstrip at Magburaka	Completed
5	Jul 2001	Kenema -Daru Road	Improvement of Road Kenema -Daru	Completed
6	Aug 2001	Kenema -Daru Road	Improvement of Kenema Daru Road and construction of 3 x pipe culvert	Completed
7	Aug 2001	Lunsar Road	Repair of bailey bridge at Lunsar	Completed
8	Nov 2001	Magburaka Koidu Road	Maintenance of Magburaka -Koidu Road	Completed
9	Oct 2001	Jui	Levelling of rehabilitation camp at Jui	Completed
10	Jan 2002	Kenema -Tongo Road	Improvement of Road Kenema -Tongo	Completed
BANENGR 2				
1.	Mar -Aug 2002	Mile 91-Magburaka Road	Repair/construction of road Mile 91 - Magburaka	Completed
2	Jun 2002	God rich	Repair and maintenance of road at Godrich (2km)	Completed
3	Sep 2002	Mabung Road	Repair and maintenance of bridge over the River RIBI at Mabung	Completed

Dhaka University Institutional Repository

Serial	Date	Location	Name of the Project/Activities	Remarks
4	Oct 2002	Hastings	Repair of water pipe line at Hastings Airfield which was damaged during the working by the airfield authority.	Completed
5.	Oct 02 to till today	Mile 91	Preparation of 6 bus stands on both side of the Road Mile 91-Magburaka	Completed
6	Oct 02 to till today	Mile 91	Preparation of Peace Monument at Kumarabai Ferry Junction	completed
7.	Oct 2002	Kumarabai	Repair of Road from Kumarabai Ferry Junction to Ferry Ghat	completed
8.	Nov 2002	Mamansu, Kafala	Construction of 1x Primary School	
9.	Nov 2002	Robinkee	Construction of 1x Primary School	
BANSIG 1 & 2				
1.	Nov 200 I	Rural Training Institute (RTI) Complex at Kenema	1 x Mosque. Approximately 300 Muslims can say their prayer at a time. Primary and basic education; programme on Arabic and English are being conducted in this mosque.	
2.	Feb 2002	"	1 x Football ground for locals	
3.	Feb 2002	"	1 x Volleyball ground for locals	
4.	May 2002	Lunsar	Donation of chair, table and benches to the Islamic School at Lunsar.	
5.	Jun 2002	"	Donation of chair, benches, blackboard, cement and CI sheet To Bangla Memorial School at Lunsar.	
6.	Jul 2002	"	Road .construction (ST peter street Road) near Lunsar market.	
7.	Aug 2002	"	Food assistance for Kasaba project near Lunsar Army Camp.	
8.	Monthly	Lunsar	Food/medicine sp to 2 x health posts at Magbil and Mange.	
9.	Jul-Aug 2002	Lunsar	Under food for work project, cultivation of swamp	
10.	Aug 2002	"	Transport support for construction of women development association near Lunsar Town.	
11.	Jun-Jul 2002	"	Transport support for renovating Lunsar Stadium.	
12.	Jul-Aug 2002	"	Reconstruction of mosque "Masjid-e-Jalil".	

Dhaka University Institutional Repository

13.	Upto Sep 2002	"	Teaching Holy Quran to the children.	
14.	Upto Nov 2002	"	Food assistance and distribution of old garments to handicapped people and war victims	
15.	09 Nov 02	Magburaka (Robol)	Renovation of Mosque	
16.	23 Mar 02	PortLoko	Bangla- Sierra Friendship School	
17.	23 Mar 02	"	Bangla-Sierra Al-Aqsa Mosque	

BANBATT 5				
1	Dec 2001	Kabala Secondary school	The abandoned school campus was cleaned and secured by the soldiers of the battalion	
2 .	Jun 2002	Kabala Secondary school	A five-room building with attached bathroom was constructed on the slope of the school hill. The Principal's bungalow and staff quarters were renovated and roofed with Cl sheets.	
3	Different Times	Kabala Secondary School	Providing food packets to all the teachers of the school,	
4	02 Nov 2002	Kabala Secondary School	Mr. Arnadu Suma, a senior teacher of the school was assisted with Le 248,000- for payment of college fees of his daughter who was a . student of Sir Milton Margai teachers' Training College on request of the Principal.	
5	Nov 2002	Kabala Secondary School	A set of text book for all the teachers was given to the school. Two footballs with one set of net, two basketballs, one chessboard were given to the students of the school.	
6	Jun 2002	Mile 91	Construction of a new Mosque	
7.	Aug 2002	Bankolia, Kabala	Construction of a new Mosque	
8.	Nov 2002	Yogomaia	Construction of a new Mosque	
9.	***Nov 2002***	Gbawuria, Kabala	Construction of a new Mosque	
10.	Nov 2002	Fadegu, Kubala Chiefdom	Construction of a new Mosque	

Dhaka University Institutional Repository

BANBATT 6				
1	Apr 2002	Mayal, Magburaka	Mosque	
2	Apr 2002	Mamanu, Magburaka	Mosque	
3	May 2002	Ferry Junction, Magburaka	Mosque	
4	Jun 2002	Magburaka	Bangla-Sierra Agricultural Farm, BANSAL	
5	Jun 2002	Kumarabai Junction, Magburaka	Mosque	
6	Jul 2002	Dukunku, Magburaka	Mosque	
7	Aug 2002	Matatoka, Magburaka	Mosque	
8	Aug 2002	Messesebe, Magburaka	Mosque	
9	Sep 2002	Rotuk, Magburaka	Mosque	
10	Sep 2002	Makali, Magburaka	Mosque	
11	Oct 2002	Makundu, Magburaka	Mosque	
12	Oct 2002	Makoni, Magburaka	Mosque	
13	Oct 2002	Makunku, Magburaka	Mosque	

BANBATT 7			
Nov2000	Krima, Lungi	Baitun-Noo Mosque	BANBATT 1
Jun 2001	Airport area Lungi	Sierra Leone Bangladesh Friendship Mosque	BANBATT-2
Mar 2002	Tntafor, Lungi	Sierra Bangla Friendship School	BANBATT 4
BNLOG 2			
Aug 2002	Moyamba	Mosque under construction	
Aug 2002	Hastings	Mosque under construction	
BANMED 2			
Oct 2002	Magburaka	Mosque under construction	
Sep 2002	Magburaka	Construction of a Madrasa	

Ref: The Bancon,UNAMSIL'S Vanguard, Army Headquarters, Dhaka, Bangladesh, PP 50-56

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৪

List of peacekeeping mission in which civilian police from Bangladesh have participated :

Sl. No.	Name of the Mission	Remarks
1.	UNTAG, Namibia	Mission on accomplished
2.	UNTAC, Cambodia	Mission on accomplished
3.	UNPROFOR, Yogoslavia	Mission on accomplished
4.	ONUMOZ, Mozambique	Mission on accomplished
5.	UNAMIR, Rwanda	Mission on accomplished
6.	UNMIH, Haiti	Mission on accomplished
7.	UNAVEM III, Angola	Mission on accomplished
8.	UNTAES, Eastern slovania	Mission on accomplished
9.	UNMIBH, Bosnia	Mission on accomplished
10.	UNTAET/UNMISET, East Temor	on going
11.	UNMIK, Kosovo	on going
12.	UNAMSIL, Sierra Leone	on going
13.	UNMIL, Liberia	on going
14.	MINUCI, Ivori cost	on going

Ref: Police Headquarters, Dhaka, Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

Total (Mission wise) number of CIV,POL.

Peacekeepers including current deployment :

Sl. No.	Name of the Mission	Total participated by police Officers
1.	UNTAG, Namibia	60
2.	UNTAC, Cambodia	298
3.	UNPROFOR, Yogoslavia	152
4.	ONUMOZ, Mozambique	103
5.	UNAMIR, Rwanda	10
6.	UNMIH, Haiti	100
7.	UNAVEM III, Angola	69
8.	UNTAES, Eastern slovania	46
9.	UNMIBH, Bosnia	181
10.	UNTAET/UNMISET East Temor	150
11.	UNMIK, Kosovo	409
12.	UNAMSIL, Sierra Leone	17
13.	UNMIL, Liberia	24
14.	MINUCI, Ivori cost	1
Total		1620

Ref : Police Headquarters, Dhaka, Bangladesh.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৬

বেনিনে বিমান দূর্ঘটনায় নিহত সেনাবাহিনীর ১৫ জন অফিসার

সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত ১৫ জন বাংলাদেশী সেনা অফিসার ছুটিতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে বেনিনে এক মর্মান্তিক বিমান দূর্ঘটনায় নিহত হয়। নিম্নে তাদের নাম, পদবী ও সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

১) লেঃ কর্নেল এস.এম. সামসুল আরেফীন ঃ তিনি ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৩য় বিএমএ স্বল্প মেয়াদী কোর্সের সাথে ৩০ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরী কালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও প্রতিষ্ঠানে কমান্ড ও স্টাফ পদে পারদর্শিতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। গত ১৯শে মে ২০০৩ তারিখে তিনি সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক হিসেবে যোগদান করেন।

২) মেজর মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া ঃ মেজর রহিম ১৯৫৪ সালে রাজবাড়ি জেলার পাচুড়িয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ২৫ জানুয়ারি ১৯৮৬ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। ১৩ জুন ২০০৩ তারিখে তিনি সিয়েরালিয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

৩) মেজর মির্জা মোঃ আঃ বাতেন ঃ মেজর বাতেন ০৪ জুন ১৯৬৩ তারিখে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৮ বিএমএ স্পেশাল কোর্সের সাথে ২৩ জুন ১৯৮৬ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিক্ষা কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ফরমেশনে স্টাফ অফিসার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে পারদর্শিতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৫ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

৪) মেজর এম রওনক আক্তার ঃ মেজর রওনক ০৪ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২১ বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইএমই কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি সেনাসদরে স্টাফ

Dhaka University Institutional Repository

অফিসার এবং সেনাবাহিনীর ইএমই ইউনিটের বিভিন্ন পদে পারদর্শীতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ০৫ মার্চ ২০০৩ তারিখে প্রথমে সিয়েরালিওন এবং পরবর্তীতে লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

৫) মেজর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী ঃ মেজর মোস্তাফিজ ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৬ বি.এম.এ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ০৯ জুন ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্ডিন্যান্স কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদান করেন।

৬) মেজর মোঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ঃ মেজর ইমতিয়াজ ০৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ তারিখে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৭ বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সাথে ২০ জুন ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ও মিলিটারী পুলিশ ইউনিটের বিভিন্ন পদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে পারদর্শীতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১১ মার্চ ২০০৩ তারিখে প্রথমে সিয়েরালিওনে এবং পরবর্তীতে লাইবেরিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

৭) মেজর মোঃ মোশাররফ হোসেন ঃ মেজর মোশাররফ ৫ জুন ১৯৬৮ তারিখে চাঁপদুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০৯ বিএমএ স্পেশাল কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইএমই কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১১ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

৮) ক্যাপ্টেন মোঃ আরিফুর রহমান তালুকদার ঃ ক্যাপ্টেন আরিফ ৩১ জানুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে টাঙ্গাইল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আর্টিলারী কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১২ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

৯) ক্যাপ্টেন মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহমেদ ঃ ক্যাপ্টেন ফরিদ ০৫ আগস্ট ১৯৭৩ তারিখে মাদারীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ইউনিট ও বাংলাদেশ রাইফেলস এর বিভিন্ন পদে পারদর্শীতার সাথে দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পালন করেন। তিনি ১২ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

১০)ক্যাপ্টেন মোঃ আলাউদ্দিন সরকার ঃ ক্যাপ্টেন আলাউদ্দিন ০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরীকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ও গোয়েন্দা ইউনিট সমূহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পারদর্শীতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৫ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

১১)ক্যাপ্টেন মোঃ রফিকুল হাসান ঃ ক্যাপ্টেন হাসান ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখে জামালপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ বিএমএ দীর্ঘমেয়াদী কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। চাকুরী কালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক ইউনিট ও প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১০ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরা লিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

১২)ক্যাপ্টেন মোঃ জাহিদুল ইসলাম ঃ ক্যাপ্টেন জাহিদ ২১ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ২৯ বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১০ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

১৩)ক্যাপ্টেন মোঃ রফিকুল ইসলাম ঃ ক্যাপ্টেন রফিক ১৫ অক্টোবর ১৯৭৩ তারিখে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৯ বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

১৪)ক্যাপ্টেন মোঃ আব্দুল মাবুদ ঃ ক্যাপ্টেন মাবুদ ০৮ এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে চুয়াডাংগা জেলায় জন্মগ্রহন করেন। তিনি ৩৪ বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদী কোর্সের সাথে ০৭ জুন ১৯৯৬ তারিখে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবাহিনীর পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। তিনি ১৯ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিওনে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম ঃ সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার শফিক ০১ জানুয়ারি ১৯৫০ তারিখে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ০৬ ডিসেম্বর ১৯৭৬ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শিক্ষা কোরে যোগদান করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পারদর্শীতার সাথে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, সেন্টার এবং স্কুলে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯ জুন ২০০৩ তারিখে সিয়েরালিয়নে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে যোগদান করেন।

সূত্র ঃ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, তারিখ- ০১-০১-২০০৪ ইং, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।